ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়নরত ছাত্রীদের সামাজিক প্রেক্ষাপট অনুসন্ধান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট এর সামাজিক বিজ্ঞান বিভাগের অধীনে মাস্টার অব ফিলোসফি ডিগ্রি অর্জনের আংশিক শর্ত পূরণের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

গবেষক

নাজমিন নাহার
রেজিস্ট্রেশন নং-০১৪
শিক্ষাবর্ষ-২০১০-২০১১
শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

নভেম্বর.২০১৬

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রীদের সামাজিক প্রেক্ষাপট অনুসন্ধান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষাবিভাগের অধীনে মাস্টার্স অব ফিলোসফি ডিগ্রি অর্জনের আংশিক শর্ত পূরনের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

গবেষক

নাজমিন নাহার
সামাজিক বিজ্ঞান বিভাগ
শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

ড.মোঃ আব্দুল মালেক
অধ্যাপক
শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

যুগ্ম তত্ত্বাবধায়ক

ড. সেলিনা বানু
অধ্যাপক
শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট

নভেম্বর,২০১৬

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি ঘোষণা করছি যে, “ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রীদের সামাজিক প্রেক্ষাপট অনুসন্ধান ” শীর্ষক আমার মাস্টার্স অব ফিলোসফি অভিসন্ধর্ভটি তত্ত্বাবধায়ক ড. আব্দুল মালেক এর নির্দেশনায় পরিচালিত একটি বস্তুনিষ্ঠ গবেষণার ফসল। এ শিরোনামে আমার কোন অভিসন্দর্ভ কিংবা এর অংশ বিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন ডিগ্রি বা প্রকাশনার জন্য ইতোপূর্বে উপস্থাপিত হয়নি।

তারিখ:১৩-১১-২০১৬

গবেষক

নাজমিন নাহার
এম.ফিল. গবেষক
রেজিস্ট্রেশন নং- ০১৪
শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রত্যয়নপত্র

আমি প্রত্যয়ন করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট এর সামাজিক বিজ্ঞান বিভাগের মাস্টার্স অব ফিলোসফি গবেষক নাজমিন নাহার কর্তৃক উপস্থাপিত "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রীদের সামাজিক প্রেক্ষাপট অনুসন্ধান" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটির চূড়ান্ত পান্ডুলিপি আদ্যপান্ত পাঠ করেছি এবং এটি মাস্টার্স অব ফিলোসফি ডিগ্রির জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যথাযথ কর্তৃপক্ষ সমীপে উপস্থাপনের জন্য সুপারিশ করছি।

তারিখ:১৩-১১-২০১৬

ড. আব্দুল মালেক
তত্ত্বাবধায়ক
অধ্যাপক
শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ড.সেলিনা বানু
যুগ্ম তত্ত্বাবধায়ক
অধ্যাপক
শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষণার সারমর্ম

নাজমিন নাহার, “ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের সামাজিক প্রেক্ষাপট অনুসন্ধান”। মাস্টার্স অব ফিলোসফি পর্যায়ের গবেষণাপত্র, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, জুন ২০১৬।

এই গবেষণাটি একটি মিশ্র গবেষণা। এখানে গুণগত ও পরিমাণগত পদ্ধতি একসাথে অনুসরণ করা হয়েছে। গবেষণার তথ্যবিশ্ব হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক ছাত্রীদের। গবেষণাটি পরিচালনা করতে গিয়ে গবেষক প্রথমে তথ্যবিশ্ব থেকে নমুনা নির্বাচনের জন্য নিঃসম্ভবনা নমুনায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করে। অতঃপর সংগৃহীত তথ্যসমূহকে সারণীবদ্ধ করার জন্য গবেষক প্রাপ্ত উপাত্তসমূহের ফ্রিকুয়েন্সী ও শতকরা হার বের করে। তারপর সেগুলোকে গ্রাফের মাধ্যমে উপস্থাপন করে। তথ্যদাতার নিকট থেকে প্রাপ্ত উপাত্তসমূহ বিশ্লেষণ করে গবেষক দেখেন যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়নরত ছাত্রীরা অধিকাংশই শহরে বসবাস করে। জেলা শহরের মেয়েরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশি অধ্যয়ন করছে। ছাত্রীরা সকলেই নিজস্ব পাকাবাড়িতে বসবাস করে। বাড়িতে রুমের সংখ্যা (৩-৪) টি। বাড়িতে ইলেকট্রিসিটি, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রীদের পিতাদের মাঝে, কেউই নিরক্ষর নন। পিতার পেশা চাকুরিজীবী এমন ছাত্রীর সংখ্যা বেশি। প্রায় সকলের ভালো খাবার গ্রহণে ছেলে ও মেয়ে উভয়ের প্রাধান্য রয়েছে। চিকিৎসার ক্ষেত্রে এ্যালোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি উভয় পন্থায় অনুসরণ করা হয়।

আবার পিতার মাসিক আয় বিবেচনা করে অধিকাংশ ছাত্রী উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করে। পরিবারগুলো ছাত্রীদের ব্যক্তিত্ব গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সাংস্কৃতিক চর্চায় মেয়েরা পরিবার থেকে কোন বাধার সম্মুখীন হন নি। আবার পড়াশোনা শেষে চাকরিতে প্রবেশের ক্ষেত্রে পরিবার থেকে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই।

প্রত্যেকটি পরিবারে ধর্মীয় বিধিনিষেধ অনুসরণ করা হয়। রাজনীতিতে অংশগ্রহনে পরিবার থেকে কোন বাধা নেই, তবে মেয়েরা রাজনীতিকে সমর্থন করে না ।পিতামাতা মেয়েদের বিয়ে ২৪ থেকে ২৬ বছর বয়সে দেয়ার পক্ষপাতী। যৌতুক গ্রহণে সকলেই এটিকে সামাজিক ব্যাধি,আইনত নিষিদ্ধ বলে মনে করেন।

পরিবার থেকে নারী ও পুরুষকে সমান দৃষ্টিতে দেখা হয়। নারী ও পুরুষ একসাথে পরিবারের কাজগুলো সম্পন্ন করে। পরিবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে মেয়েদের মতামতের অগ্রাধিকার রয়েছে। অধিকাংশ মেয়েরা তাদের সামাজিক পরিবেশ থেকে সহায়তা লাভ করেছে। কিছু কিছু মেয়ে সামাজিক পরিবেশ থেকে বিরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন। অনেক মেয়ে শিক্ষাজীবনে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছেন।

সুতরাং অনুমিত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল “ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করে।” তা সত্য প্রমাণিত হলো।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমি প্রথমেই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার সৃষ্টিকর্তার প্রতি,তাঁর অসীম রহমতে আমি গবেষণাটি সমাপ্ত করতে পেরেছি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনিস্টিটিউটে স্নাতক অধ্যয়নকালীন সময়ে আমি রোকেয়া হলের আবাসিক ছাত্রী ছিলাম। আমার রুমমেট ছিল কুমিল্লা, নাটোর, বাগেরহাট, কুষ্টিয়া জেলার মেয়েরা। বিভিন্ন জেলার ছাত্রীদের সাথে বসবাসের অভিজ্ঞতা বিচিত্র। এ বিচিত্র অভিজ্ঞতায় আমাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের সামাজিক প্রেক্ষাপট গবেষণায় আগ্রহী করে। আমি আমার আগ্রহের বিষয়টি আমার তত্ত্বাবধায়কের সাথে আলোচনা করি, এরই পরিপ্রেক্ষিতে আমার তত্ত্বাবধায়ক প্রফেসর ড. আব্দুল মালেক স্যার আমাকে " ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের সামাজিক প্রেক্ষাপট অনুসন্ধান " বিষয়টি নিয়ে আমাকে গবেষণায় নিযুক্ত করে। গবেষণা কর্মটির প্রস্তাবনা প্রণয়ন থেকে অভিসন্দর্ভ জমা দেয়া পর্যন্ত পুরো সময়টি তিনি নিরলসভাবে এবং অত্যান্ত স্নেহময় দৃষ্টিতে আমাকে নির্দেশনা দিয়ে এসেছেন। এ জন্য প্রথমেই আমি তাঁর প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আমি আরও শ্রদ্ধাবনতচিত্তে স্মরণ করছি আমার যুগ্ম তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. সেলিনা বানুকে ম্যাডামকে, যিনি শত ব্যস্ততার মাঝে আমাকে তাঁর মূল্যবান সময় দেন, গবেষণার প্রতিটি ধাপে তিনি আমাকে সুনির্দেশনা ও সুপরামর্শ দিয়ে উৎসাহিত করেন।

গবেষণাকার্য সমাপ্তির জন্য আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ আমার তত্ত্বাবধায়ক এর প্রতি, এত দীর্ঘসময়ে গবেষণাকার্য চলাকালীন প্রতিটি ধাপে তিনি আমাকে নির্দেশনা দিয়েছেন।

কখনও কখনও ভুলভান্তির কারণে তাঁর আবেগপূর্ণ কথা আমাকে কাজে অলসতা পরিহার করে পুনরায় কাজে আত্মনিয়োগে উদ্বুদ্ধ করেছে।

এছাড়া ২০১১ সাল থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত প্রায় ৬ বছর গবেষণা চলাকালীন সময়ে আমার পারিবারিক বিভিন্ন সমস্যায় তিনি ধৈর্য্যসহকারে আমার সমস্যাগুলো শুনেন এবং অনুধাবন করে আমাকে যথোপযুক্ত সহায়তা করেন, এজন্য আমি আমার স্যারের প্রতি চিরঋণী।

গবেষণাকার্য চলাকালীন গবেষণা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বই,জার্নাল, থিসিস পাঠের প্রয়োজন ছিল। আই.ই আর. এর লাইব্রেরীয়ান রফিক ভাইকে আমি ধন্যবাদ জানাই এজন্য যে, তিনি আমাকে গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বই পাঠের সুযোগ দিয়েছে। যা আমাকে গবেষণাকার্য প্রতিনিয়ত সহায়তা করেছে।

গবেষণার তথ্য সংগ্রহের কাজে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলের আবাসিক শিক্ষার্থীবৃন্দ যাঁরা শত ব্যস্ততার মধ্যে তাঁদের মূল্যবান সময় দিয়ে তথ্য সরবরাহ করেছে গবেষক তাদেরকেও আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছে।

আই.ই.আর. এর একাদশ ও দ্বাদশ ব্যাচের শিক্ষার্থীগণ, সিনিয়র ভাইয়া ও শুভানুধ্যায়ীগণ গবেষককে তথ্য সংগ্রহের কাজ ছাড়াও বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছে, গবেষক তাদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছে। গবেষণা প্রতিবেদন তৈরীতে যে সকল লেখক ও গবেষকদের বই ও গবেষণাপত্রের সাহায্য নেয়া হয়েছে গবেষক তাদের সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে।

আমি বিনয়ের সাথে স্মরণ করছি আমার বাবা জনাব নাজমুল হক চৌধুরীকে। তাঁর আকাঙ্ক্ষাই আমাকে উচ্চ শিক্ষার পথে ধাবিত করেছে। তাঁর অনুপ্রেরণা আমাকে চলার পথে সাহস যুগিয়েছে। গবেষণাকালীন সময়ে ছোট ছোট বিভ্রান্তি দুর করতে আমার স্বামী জনাব মোঃ আশিক ইমতিয়াজ আমাকে সহায়তা করেন। বিভিন্নসময়ে গবেষণাপত্র প্রিন্টের সময় তাঁর উপস্থিতি আমাকে উৎসাহিত করেছে।

নাজমিন নাহার

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র	পৃষ্ঠানং
ঘোষণাপত্র	
প্রত্যয়নপত্র	
গবেষণার সারমর্ম	
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	
প্রথম অধ্যায়	১-২৩
১.১. ভূমিকা	১
১.২. গবেষণার যৌক্তিকতা	৬
১.৩. সমস্যার বিবরণ	৯
১.৪. গবেষণার লক্ষ্য	১৪
১.৫. গবেষণার উদ্দেশ্য	১৪
১.৬. গবেষণার প্রশ্ন	১৪
১.৭. গবেষণার প্রত্যয়সমূহের সংজ্ঞা	১৫
১.৮. গবেষণার সীমাবদ্ধতা	২৩
দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ গবেষণার পদ্ধতি ও কৌশল	২৫-৩২
২.১. গবেষণায় অনুসৃত পদ্ধতি	২৬
২.২. গবেষণার রূপরেখা	২৮
২.৩. বিষয় নির্বাচন	২৮
২.৪. প্রস্তুতিপর্ব ও পর্যালোচনা	২৮
২.৫. গবেষণার প্রকৃতি ও ক্ষেত্র	২৯
২.৬. নমুনা নির্বাচন ও নমুনায়ন কৌশল	২৯
২.৭. উপাত্ত সংগ্রহের সময়কাল	২৯
২.৮.তথ্য সংগ্রহপত্র তৈরি	৩০
২.৯. উত্তর পদ্ধতি	৩২
২.১০. উপাত্ত সংগ্রহ	৩২
২.১১. উপাত্ত বিন্যাস	৩২
২.১২. তথ্য বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া	৩২
২.১৩. সিদ্ধান্ত ও সুপারিশ	৩২
তৃতীয় অধ্যায়ঃ সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনা	৩৩-৩৬

Dhaka University Institutional Repository

৩.১. সংশ্লিষ্ট পুস্তক পর্যালোচনা	৩৪
৩.২. সংশ্লিষ্ট গবেষণাকর্ম পর্যালোচনা	৩৬
চতুর্থ অধ্যায়ঃ নারী শিক্ষা:উদ্ভব ও বিকাশ	৪১-৫৪
৪.১. নারী শিক্ষার উদ্ভব ও বিকাশ	৪২
৪.২. নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিশ্ব ইতিহাস	৫৪
পঞ্চম অধ্যায়ঃ বাংলাদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রূপান্তরের ধারায় নারী	৫৯-৫২
৫.১. বাংলাদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রূপান্তরের ধারায় নারী	৬০-৬৮
ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	৬৯-৯৫
৬.১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ	৭০
৬.২. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের ভর্তির অধিকার ও সহশিক্ষার সূচনা	৮৫
৬.৩. ভাষা আন্দোলন ও উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে নারীর অংশগ্রহণ	৮৯
৬.৪. পাকিস্তান আমলে ও স্বাধীনতা পরবর্তীসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নারী-নেত্রীদের সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকান্ড	৯৫
সপ্তম অধ্যায়ঃ উপাত্ত উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ	১০১-১৪৮
অষ্টম অধ্যায়ঃ ফলাফল,সিদ্ধান্ত ও সুপারিশ	১৪৯-১৫৬
৮.১. গবেষণার ফলাফল	১৫০
৮.২. গবেষণার সুপারিশ	১৫৭
৮.৩. গবেষণার সিদ্ধান্ত	১৫৬
উপসংহার	১৫৯
গ্রন্থপঞ্জি	১৬১
পরিশিষ্ট	১৬৫

Dhaka University Institutional Repository

সারণী সমূহের তালিকা

ক্রমিক নং	তালিকা	পৃষ্ঠা নং
সারণী নং-১	অধ্যয়ন বর্ষ	১০২
সারণী নং-২	বসবাস	১০৩
সারণী নং-৩	ধর্ম	১০৪
সারণী নং-৪	পরিবারের সদস্য	১০৫
সারণী নং-৫	বাবার শিক্ষাগত যোগ্যতা	১০৬
সারণী নং-৬	মায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতা	১০৮
সারণী নং-৭	বাবার পেশা	১০৯
সারণী নং-৮	মায়ের পেশা	১১০
সারণী নং-৯	বাবার মাসিক আয়	১১১
সারণী নং-১০	মায়ের মাসিক আয়	১১২
সারণী নং-১১	আয়ের অন্যান্য উৎস	১১৩
সারণী নং-১২	বসবাসের স্থান	১১৫
সারণী নং-১৩	বাড়ির ধরন	১১৬
সারণী নং-১৪	বাড়িটি কেমন	১১৭
সারণী নং-১৫	কক্ষের সংখ্যা কতটি	১১৮
সারণী নং-১৬	ইলেকট্রিসির অবস্থা	১১৯
সারণী নং-১৭	স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা	১২০
সারণী নং-১৮	নিজস্ব বাহন	১২১
সারণী নং-১৯	খাবারের অগ্রাধিকার	১২২
সারণী নং-২০	চিকিৎসার সহায়তা	১২৩
সারণী নং-২১	চিকিৎসার অগ্রাধিকার	১২৪
সারণী নং-২২	রাজনীতিতে অংশগ্রহণ	১২৫
সারণী নং-২৩	মতামত প্রকাশ	১২৬
সারণী নং-২৪	ভোট দেয়ার অধিকার	১২৭
সারণী নং-২৫	ধর্মীয় বিধিনিষেধ	১২৮
সারণী নং-২৬	সাংস্কৃতিক চর্চা	১২৯
সারণী নং-২৭	সাংস্কৃতিক চর্চায় প্রতিবন্ধকতা	১৩০

Dhaka University Institutional Repository

সারণী নং-২৮	পছন্দের অনুষ্ঠান	১৩১
সারণী নং-২৯	মেয়েদের উচ্চশিক্ষা	১৩২
সারণী নং-৩০	পিতামাতার আগ্রহ	১৩৩
সারণী নং-৩১	আপনার মতামতের গুরুত্ব	১৩৪
সারণী নং-৩২	নারী শিক্ষায় প্রতিবন্ধকতা	১৩৫
সারণী নং-৩৩	বিবাহের বয়সসীমা	১৩৭
সারণী নং-৩৪	যৌতুক প্রদান	১৩৮
সারণী নং-৩৫	পারিবারিক বন্ধন রক্ষা	১৪০
সারণী নং-৩৬	নারী-পুরুষের ভূমিকা	১৪০
সারণী নং ৩৭	পরিবারের কাজ	১৪১
সারণী নং-৩৮	মর্যাদা	১৪৪
সারণী নং-৩৯	চাকরীতে প্রবেশ	১৪৪
সারণী নং-৪০	কাঙ্খিত ব্যক্তিত্ব	১৪৫
সারণী নং-৪১	সামাজিক পরিবেশ	১৪৬
সারণী নং-৪২	চ্যালেঞ্জ	১৪৭

Dhaka University Institutional Repository

গ্রাফ সমূহের তালিকা

গ্রাফ নং	তালিকা	পৃষ্ঠা নং
গ্রাফ নং-১	অধ্যয়ন বর্ষ	১০৩
গ্রাফ নং-২	বসবাস	১০৪
গ্রাফ নং-৩	ধর্ম	১০৫
গ্রাফ নং-৪	পরিবারের সদস্য	১০৬
গ্রাফ নং-৫	বাবার শিক্ষাগত যোগ্যতা	১০৭
গ্রাফ নং-৬	মায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতা	১০৮
গ্রাফ নং-৭	বাবার পেশা	১০৯
গ্রাফ নং-৮	মায়ের পেশা	১১০
গ্রাফ নং-৯	বাবার মাসিক আয়	১১২
গ্রাফ নং-১০	মায়ের মাসিক আয়	১১৩
গ্রাফ নং-১১	আয়ের অন্যান্য উৎস	১১৪
গ্রাফ নং-১২	বসবাসের স্থান	১১৬
গ্রাফ নং-১৩	বাড়ির ধরন	১১৭
গ্রাফ নং-১৪	বাড়িটি কেমন	১১৮
গ্রাফ নং-১৫	কক্ষের সংখ্যা কতটি	১১৯
গ্রাফ নং-১৬	ইলেকট্রিসির অবস্থা	১২০
গ্রাফ নং-১৭	স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা	১২০
গ্রাফ নং-১৮	নিজস্ব বাহন	১২২
গ্রাফ নং-১৯	খাবারের অগ্রধিকার	১২৩
গ্রাফ নং-২০	চিকিৎসার সহায়তা	১২৪
গ্রাফ নং-২১	চিকিৎসার অগ্রাধিকার	১২৫
গ্রাফ নং-২২	রাজনীতিতে অংশগ্রহণ	১২৬
গ্রাফ নং-২৩	মতামত প্রকাশ	১২৭
গ্রাফ নং-২৪	ভোট দেয়ার অধিকার	১২৮
গ্রাফ নং-২৫	ধর্মীয় বিধিনিষেধ	১২৯
গ্রাফ নং-২৬	সাংস্কৃতিক চর্চা	১৩০
গ্রাফ নং-২৭	সাংস্কৃতিক চর্চায় প্রতিবন্ধকতা	১৩১
গ্রাফ নং-২৮	পছন্দের অনুষ্ঠান	১৩২
গ্রাফ নং-২৯	মেয়েদের উচ্চশিক্ষা	১৩৩

গ্রাফ নং-৩০	পিতামাতার আগ্রহ	১৩৪
গ্রাফ নং-৩১	আপনার মতামতের গুরুত্ব	১৩৫
গ্রাফ নং-৩২	নারী শিক্ষায় প্রতিবন্ধকতা	১৩৬
গ্রাফ নং-৩৩	বিবাহের বয়সসীমা	১৩৮
গ্রাফ নং-৩৪	যৌতুক প্রদান	১৩৯
গ্রাফ নং-৩৫	পারিবারিক বন্ধন রক্ষা	১৪০
গ্রাফ নং-৩৬	নারী-পুরুষের ভূমিকা	১৪১
গ্রাফ নং-৩৭	পরিবারের কাজ	১৪৩
গ্রাফ নং-৩৮	মর্যাদা	১৪৩
গ্রাফ নং-৩৯	চাকরীতে প্রবেশ	১৪৪
গ্রাফ নং-৪০	কাঙ্খিত ব্যক্তিত্ব	১৪৫
গ্রাফ নং-৪১	সামাজিক পরিবেশ	১৪৬
গ্রাফ নং-৪২	চ্যালেঞ্জ	১৪৭

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

১.১. ভূমিকা

১.২. গবেষণার যৌক্তিকতা

১.৩. সমস্যার বিবরণ

১.৪. গবেষণার লক্ষ্য

১.৫. গবেষণার উদ্দেশ্য

১.৬. গবেষণা প্রশ্ন

১.৭. গবেষণার প্রত্যয়সমূহের সংজ্ঞা

১.৮. গবেষণার সীমাবদ্ধতা

প্রথম অধ্যায়
গবেষণা পরিচিতি

১.১.ভূমিকা

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশ। বাংলাদেশের জনসংখ্যার এক বিশাল অংশ নারী। তাদের উন্নয়ন তাই জাতীয় উন্নয়নের পূর্বশর্ত। দীর্ঘদিন আমাদের এই দেশটি শাসকগোষ্ঠীর শোষণের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হয়েছে, শাসকগোষ্ঠী আমাদের দেশের মানুষকে জিম্মি করে সমস্ত অধিকার নিজেদের কুক্ষিগত করে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিল।

এদেশের মানুষ তা মেনে নেয়নি। এর ফলশ্রুতিতে ১৯৪৭ সালে যখন দেশ বিভক্ত হয় তখন মুসলমান মেয়েদের শিক্ষার হার ছিল খুবই সামান্য। ইংরেজি শিক্ষার কথা ধরলে শিক্ষিত মুসলমান মহিলাদের সংখ্যা হাতে গোনা যেত। সারা পূর্ব বাংলার কজন মহিলা সেকালে চাকরি করতেন; সে সংখ্যা কেউই জানতো না; কিন্তু ছোট বড় চাকরি মিলে সেটা কয়েকশর বেশি ছিল বলে মনে হয় না।[১] এহেন পরিস্থিতিতে ১৯৭১ সালে পূর্ব বাংলায় মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধকালীন ১৯৭১ সালে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের সময় পূর্ব বাংলার লোকেরা বহু অসাধারণ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গেছেন। যুদ্ধের পর দেশে এমন অর্থনৈতিক অবস্থার সৃষ্টি হলো যা মহিলাদের পরিবর্তনে বিপুলভাবে সহায়তা করেছে। তখন পারিবারিক আয় বাড়ানোর জন্য পুরুষের পাশাপাশি মহিলারা চাকরির সন্ধানে বাসা থেকে বের হতেন। সরকার শতকরা ১০ ভাগ চাকরি মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ করেন।

মহিলারা ৯০ দশকে এসে নিজেদের যোগ্যতা দিয়ে পুরুষের সঙ্গে লেখাপড়া এবং চাকরির ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করেছেন। আশি ও নব্বই এর দশকে বাংলাদেশের মেয়েরা লক্ষণীয়ভাবে এগিয়ে গেছে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়ে যারা চাকরি পেয়েছেন। তাদের অনুপাত আগের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এভাবেই প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগের উচ্চপদে এখন তারা অধিষ্ঠিত

[১] হোসেন.সেলিনা ও মাসুদজ্জামান, ইদানীং মহিলারা, বাংলাদেশের নারী ও সমাজ, মাওলা ব্রাদার্স,ঢাকা

হয়েছেন। দু তিন দশক আগেও এ ধরনের চাকরিতে মহিলাদের কল্পনা করা যেত না। কিন্তু এখন এ ধরনের পদে ও পেশায় মহিলাদের দেখে দেখে মহিলাদের ক্ষমতা সম্পর্কে পুরুষদের ধারণা এবং সামগ্রিকভাবে মহিলাদের ভাবমূর্তি বদলে যায়। তার চেয়েও যা গুরুত্বপূর্ণ তা হলো, মেয়েরা নিজেরাই বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছেন যে তারা পুরুষদের তুলনায় ছোট না।

সরকারি চাকরি ছাড়াও, বেসরকারি খাতে মহিলাদের জন্য, বিশেষ করে সামান্য লেখাপড়া জানা অথবা অশিক্ষিত মহিলাদের জন্য একটা মস্ত বড় সুযোগ এসেছে পোশাক শিল্পের প্রসার ঘটায়।

পোশাক শিল্পের শতকরা ৯০ ভাগ এর বেশি কর্মী মহিলা। এ শিল্পে নিয়োজিত কর্মীর সংখ্যাও কম নয়, কয়েক লাখ। নিয়মিত আয় করতে আরম্ভ করে এসব মহিলারা নিজ নিজ পরিবারে নতুন মর্যাদা লাভ করেছেন এবং নিজেদের অধিকার সর্ম্পকে দ্রুত সচেতন হয়ে উঠছেন। বাংলাদেশের নারী প্রগতিতে পোশাক শিল্পের অবদান নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলাদেশে চিংড়ি চাষ, ব্যাংঙের পা রপ্তানি, তাঁতশিল্প এবং হস্তশিল্পের সাথে হাজার মহিলা যুক্ত আছেন।

বাংলাদেশ সরকার ২০২১ সালের রূপকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নারী ও শিশুদের উন্নয়নে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে মেয়েদের শিক্ষা অবৈতনিক করে নারী শিক্ষিত করার মাধ্যমে, বাংলাদেশে নারীদের ক্ষমতা বৃদ্ধির কাজ করে যাচ্ছে সরকার, যা জাতীয়ভাবে শিক্ষা বিস্তারে ভালো অবদান রাখছে।[২]

বাংলাদেশ ইতিমধ্যে লিঙ্গবৈষম্য ও নারীদের জন্য জাতীয় পর্যায়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা নিশ্চিত করে ইউএনডিপি-র সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) এই ব্যাপারে অনেক দেশ থেকে এগিয়ে আছে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী, বিরোধীদলীয় নেতা, এবং জাতীয় সংসদের স্পিকারের পদসমূহ নারীরা নেতৃত্ব দিচ্ছেন। বর্তমানে জাতীয় সংসদে মহিলা সাংসদের সংখ্যা ২০% এ এসে দাঁড়িয়েছে, যা পৃথিবীর যে কোন দেশে বেশ বিরল।

২.
www.bangladesh.gov.bd.

দেশের মোট ৮ কোটি নারী। এদের মধ্যে কয়েকজন ক্ষমতাধর নারীর উদাহরণ দেয়া যায়। বিমান পরিচালনা,প্যারাসূট, জাম্পিং হিমালয়ের চূড়া- কোথায় নেই নারী। কিন্তু সামাজিক মাপকাঠিতে এখনও নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়ন হয়নি। সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও ক্ষমতায়নে নারীর অবস্থান এখনও দুর্বল। দীর্ঘ সংগ্রামের ফলে লাখ লাখ নারী তাদের সক্ষমতা অর্জন করেছেন।[৩]

তবুও গাঁ-গঞ্জের অজ্ঞ-অনক্ষর-স্বাক্ষর সমাজে অনুঢ়া মেয়েরা মারাত্মক সমস্যার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে সব সমপ্রদায়ের মানুষের পক্ষে। পণ বা যৌতুক দিয়ে যোগাড় করতে হয় বর। সে যৌতুক যোগাড় করা সম্ভব হয় না দরিদ্র পিতামাতার পক্ষে। যৌতুকের অর্থ সামগ্রী পরিশোধের মিথ্যা অঙ্গীকার শপথ করে কন্যার বিয়ে দিলে বিবাহোত্তরকালে ছয়মাস কিংবা বছরের মধ্যেই যৌতুকের বাকি অর্থ বা সামগ্রী না দিলে বধূকে পিটিয়ে মারা, তালাক-ত্যাগের মাধ্যমে বাপের বাড়িতে ফিরিয়ে দেয়া প্রভৃতি গোটা উপমহাদেশে একটা অমানবিক বর্বরতার বিস্তার ঘটাচ্ছে। প্রতিবছর কয়েকহাজার নারী এভাবে পীড়িত-নির্যাতিত-লাঞ্চিত হয়ে হতাশায় ও আত্মহত্যায় অকালে প্রাণ হারাচ্ছে।[৪] আবার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত অনেক নারী পরিবার,সন্তান, স্বামী, সংসারের সম্মান রক্ষায় নিজের স্বপ্নের বিসর্জন ঘটায়।

উন্নয়নের কাঙ্খিত স্তরে যেতে হলে পুরুষের পাশাপাশি নারীকেও স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। নারীকে তার স্বমর্যাদা প্রতিষ্ঠায় একমাত্র শিক্ষাব্যবস্থায় অগ্রনী ভূমিকা পালন করতে পারে। ব্যানবেইস ২০১২ এর তথ্যসূত্র থেকে লক্ষ করা যায়। প্রাথমিক পর্যায়ে নারীর শিক্ষাক্ষেত্রে অংশগ্রহণ প্রায় শতভাগ হলেও , শিক্ষার পরবর্তী পর্যায়গুলোতে নারীর অংশগ্রহণের হার ক্রমান্বয়ে কমে এসেছে। দেশের উচ্চ পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ অতীতের তুলনায় বৃদ্ধি পেলেও তা সন্তোষজনক নয় মোটেও।

৩.উচ্চশিক্ষা ও চাকরিতে নারী এখনো পিছিয়ে,প্রথম আলো,৭ মার্চ,২০১৫
৪.হোসেন,সেলিনা ও মাসুদজ্জামান, শাস্ত্র ,সমাজ ও নারীমুক্তি, পৃঃ-২১, বাংলাদেশের নারী ও সমাজ,মাওলা ব্রাদার্স

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণ পুরুষদের সমান বা কিছুটা বেশি। কিন্তু উচ্চশিক্ষা ও চাকরিতে অনেক পিছিয়ে নারীরা। বর্তমানে সরকারি চাকুরেদের মধ্যে নারী মাত্র ২৪ শতাংশ। আর বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর মধ্যে নারী মাত্র ৩৩ শতাংশ।

নারীদের কাছে প্রাথমিক শিক্ষার পাশাপাশি উচ্চশিক্ষার সুবিধা পৌঁছে দেয়ার নিমিত্তে **১৯২১** সালে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একটি ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠান। **১৯২১** সালে বঙ্গভঙ্গের প্রেক্ষাপটে নির্মিত এ প্রতিষ্ঠানটি স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের একটি হাতিয়ার রূপে সৃষ্টির সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে সহশিক্ষার সুযোগ সীমিত ছিল। সাম্প্রতিক কালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহশিক্ষার একটি আদর্শ নমুনা।ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দেশের উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ শিক্ষার্থীর প্রতিনিধিত্ব করে ।[৫]

বাংলাদেশের নারীদের উপযুক্ত সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে, এ বিষয় জিজ্ঞাস্য যে, এই প্রতিষ্ঠান থেকে অথবা এই প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ছাত্রীরা কোন সামাজিক প্রেক্ষাপট থেকে এসেছে। সামাজিক প্রেক্ষাপট শব্দটি পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক সকল বিষয়ের সমন্বিত রূপ। উপরিউক্ত সামাজিক পরিস্থিতিতে উচ্চশিক্ষারত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের সামাজিক প্রেক্ষাপট জানা গবেষকের একমাত্র লক্ষ্য। গবেষক মনে করেন যদি সামাজিক প্রেক্ষাপট জানা যায়, তবে তা দেশ ও জাতির সামগ্রিক কল্যাণে সহায়ক হবে।

৫.https://bn.wikipedia.org/wiki/

১.২.গবেষণার যৌক্তিকতা

জীবনকে সুন্দর সাবলীলভাবে গড়ে তোলার জন্য শিক্ষা মানুষকে পথ প্রদর্শন করে থাকে। যে কোন জাতির উন্নতির হাতিয়ার সুপরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থা। কর্মসংস্থান, সক্ষমতা, ব্যবসায়, রাজনৈতিক নেতৃত্ব- এ তিন সূচকেই বাংলাদেশের নারীরা এগিয়েছে। এর ফলে এই তিন সূচকে পুরুষের সাথে নারীর ব্যবধান কমেছে। প্রযুক্তিভিত্তিক লেনদেন সেবা প্রদানকারী বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠান মাস্টারকার্ডের এক জরিপে এ তথ্য উঠে এসেছে। ২০১৪ সালের দ্বিতীয়ার্ধে "ইনডেক্স অব উইমেনস অ্যাডভান্সমেন্ট " (আইডব্লিউএ) শীর্ষক জরিপটি করা হয়। মূলত শিক্ষা গ্রহণ করে নারীরা কর্মসংস্থান বা নেতৃত্বে কতটা আসতে পারছে, সেটি জানা যায় এই জরিপে।

জরিপে আরও দেখা গেছে যে, বিগত আট বছরে প্রতিটি সূচকেই ধারাবাহিকভাবে বাংলাদেশের পয়েন্ট বেড়েছে। তার মানে হলো, বাংলাদেশের নারীদের অবস্থানের উন্নতি হয়েছে।

এ বছরের জরিপ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, কর্মসংস্থান সূচকে বাংলাদেশ ৮৩ দশমিক ৩ পয়েন্ট পেয়ে দশম স্থানে আছে। এ সূচকে বাংলাদেশের পিছনে রয়েছে ভারত, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলঙ্কা, ফিলিপাইন, ভিয়েতনাম। শিক্ষার মাধ্যমে নিজেদের উপযোগী বা সক্ষমতা গড়ে তোলার সূচকে ৮৭ দশমিক ৬ পয়েন্ট পেয়েছে বাংলাদেশ।

এ সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ১৪তম। শিক্ষার মাধ্যমে বাংলাদেশের নারীরা নিজেদের উপযোগী করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের নারীদের অবস্থান বেশ দুর্বল। ১৬ দেশের মধ্যে বাংলাদেশ সর্বশেষ অবস্থানে রয়েছে। বাংলাদেশের পয়েন্ট মাত্র ১২ দশমিক ১।

এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ১৬ টি দেশের নারীর আর্থ সামাজিক অবস্থান তুলে ধরার জরিপটি চালানো হয়। ১৬ দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ৪৪ দশমিক ৬ পয়েন্ট পেয়ে সার্বিকভাবে ১৫ তম স্থানে রয়েছে।[৬]

নারী নিয়ে গবেষণা করেন এমন বিশেষজ্ঞরা বলছেন,নারীদের পিছিয়ে থাকার বড় কারণ হলো বাল্যবিবাহ ও সামাজিক নিরাপত্তার অভাব। জাতিসংঘ শিশু তহবিলের(ইউনিসেফ) প্রতিবেদনের তথ্য দিয়ে তাঁরা বলছেন,দেশে এখনো ১৮ বছরের আগে ৬৬ শতাংশ মেয়ের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। এ কারণে উচ্চশিক্ষার আগেই ঝরে পড়ছে তাঁরা। আবার উচ্চশিক্ষা শেষ করেও পারিবারিক ও সামাজিক বাধায় অনেক নারী চাকরি করেন না বা ইচ্ছে থাকলেও করতে পারেন না। এ বিষয়ে সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরীর মতে,"নারীর উচ্চশিক্ষায় প্রবেশের পথে এখনো অনেক প্রতিবন্ধকতা আছে। বিশেষ করে মফস্বল এলাকায় মেয়েদের বেলায় এটা আরও বেশি। উচ্চশিক্ষার জন্য বাড়ির বাইরে বের হলে আবাসনের অভাবসহ বেশকিছু প্রতিবন্ধকতায় পড়তে হয় মেয়েদের। এর সঙ্গে সামাজিক নিরাপত্তার অভাব ও দারিদ্রতার কারণে অনেক বাবা-মা আগে আগেই মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দিচ্ছেন। এ কারণে চাকরিতেও নারীর সংখ্যা কম।

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর(ব্যানবেইস) সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী,প্রাথমিকে দেশে যত শিক্ষার্থী পড়াশুনা করছে, তার মধ্যে ৫০ শতাংশ ছাত্রী। অন্যরা ছাত্র। মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রীর সংখ্যা ৫৩ আর ছাত্র ৪৭ শতাংশ। কলেজ পর্যায়ে মোট শিক্ষার্থীর মধ্যে ৪৭ শতাংশ ছাত্রী। এতে দেখা যাচ্ছে,কলেজ পর্যন্ত নারীর অংশগ্রহণ ভালো।

কিন্তু উচ্চশিক্ষা ও পেশাগত শিক্ষার স্তরে গিয়ে নারীর সংখ্যা কমে যাচ্ছে। ব্যানবেইস সর্বশেষ প্রতিবেদন হিসাবে চিকিৎসা,আইনসহ পেশাগত শিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণ বাড়ছে। আর বিশ্ববিদ্যালয়

৬.প্রথম আলো,কর্মসংস্থান ও সক্ষমতায় বাংলাদেশের অগ্রগতি মাস্টার কার্ডের জরিপ, ৮ মার্চ,২০১৫.

পর্যায়ে যত শিক্ষার্থী এখন পড়াশুনা করছেন, তাদের ৩৩ শতাংশ নারী। তবে পরিসংখ্যান বলছে,প্রতিবছর এসব স্তরেও নারীর অংশগ্রহণ বাড়ছে।

তবে শিক্ষাজীবন শেষ করে চাকরিতে প্রবেশের সময় নারীর অংশগ্রহণ অনেক কমে যাচ্ছে ।[৭] তবে সরকারি চাকরিতে প্রতিবছর নারী কর্মীর সংখ্যা বাড়ছে।

- ২০১১ সালে সরকারি চাকরিতে নারীকর্মীর সংখ্যা ২ লাখ ৫০ হাজার ১৯৯জন।
- সেখানে ২০১২ সালে নারী কর্মীর সংখ্যা ২ লাখ ৫২ হাজার ৮৪৫ জন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা আজ রাষ্ট্রের ও সমাজের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত। তারা অনেক ক্ষেত্রে পুরুষদের সমমর্যাদায় বা কোথাও কর্মজীবনে পুরুষদের চেয়ে সফল ও ঈর্ষনীয় স্থানে অবস্থান করছেন। সমাজ গঠনে, রাজনীতি ও অর্থনীতিতে অসাধারণ অবদান আজ তাদেরকে নারী নেতৃত্বের অগ্রপথিক হিসেবে স্বীকৃতি এনে দিয়েছে। আবার জ্ঞান অন্বেষণে আমাদের নারীরা বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ছে। তারা তাদের অধীত জ্ঞান ও উৎকর্ষতা নিয়ে দেশ সেবায় সম্পৃক্ত হচ্ছে। আবার বিদেশ থেকেও অনেক দেশের পক্ষে গৌরবময় ভূমিকা পালন করছে। তবে কোথাও কোথাও প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি সমান হয় নি।[৮]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রী লীলা নাগ। বিশ শতকের অবরুদ্ধ সমাজ ব্যবস্থায় লীলা রায় ছিলেন মুক্ত মনের অধিকারী, সংগ্রামী সাহসী আশ্চর্য মানবী।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব বাংলার শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে আলোচিত ভূ-মন্ডল তৈরী হয়েছিল সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা কতটা সূদুর প্রসারী তা বলার উপেক্ষা রাখে না। ভাষা

৭নারী এখনো পিছিয়ে,প্রথম আলো,৭ মার্চ.২০১৫

৮.হোসেন,সেলিনা,নারী প্রগতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও রোকেয়া হল,শ্রাবণ প্রকাশনী,ঢাকা ।

আন্দোলন, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীন বাংলাদেশ গঠন, নব্বই এর আন্দোলন ইত্যাদি তাবৎ সংগ্রামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ডে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত হয়ে আছে।

আজকের নারী সমাজের যে বিজয়কেতন উড়ছে, তার পতাকাবাহী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। সুতরাং যে আলোকবর্তিকা সমাজকে উদ্দীপ্ত করলো, আলোকিত করল, তার স্বরূপ, ক্রমবিকাশ ও বর্তমান প্রেক্ষিত জানা প্রয়োজন।[৯]

১.৩.সমস্যার বিবরণ

সৃষ্টির আদিকাল থেকে নারী ও পুরুষের বৈষম্য সামাজিক প্রথা হিসেবে চলে আসছে। হিন্দু কিংবা মুসলিম কোন ধর্মেই নারী শিক্ষার অধিকার ছিল না। হিন্দুরা বিশ্বাস করতো নারীরা লেখাপড়া করলে স্বামীর অকাল মৃত্যু হবে; সে হবে বিধবা। সুতরাং এই ভয়াবহ বৈধব্যের ভয়ে হিন্দু মেয়েরা অক্ষরজ্ঞানে ভীত ছিল। মুসলিম সমাজে নারীদের ধর্মগ্রন্থ পাঠ অনুমোদন থাকলেও জীবনে প্রায়োগিক শিক্ষার অধিকার ছিল না। সমাজ ও সংস্কারের ভয়ের উর্ধ্বে উঠে কিছু দুঃসাহসী পুরুষ তাদের কন্যা, ভগ্নি, স্ত্রীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। সেইসব উদার হৃদয়বান পুরুষদের জন্য নারীজাতির অন্ধত্ব মোচন হয়। তারা জ্ঞানের আলোর স্পর্শ পায় এবং তাদের দৃষ্টি প্রসারিত হয়। সেভাবে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন তার ভাইয়ের নিকট মোমবাতির আলোয় লেখাপড়া শিখে পরবর্তীকালে মুসলিম সমাজে মেয়েদের জন্য আলোকবর্তিকা হয়েছিলেন।[১০] সেই আলোর দিশারী হয়েই মুসলমান মেয়েরা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ওঠে। বর্তমান শতাব্দীতে নারী শিক্ষা একটি অন্যতম আলোচিত বিষয়।

৯.প্রথম আলো,কর্মসংস্থান ও সক্ষমতায় বাংলাদেশের অগ্রগতি মাস্টার কার্ডের জরিপ, ৮ মার্চ,২০১৫

১০হোসেন.সেলিনা,নারী প্রগতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও রোকেয়া হল, পৃ-২৩,শ্রাবণ প্রকাশনী.ঢাকা,পৃ-২৩

Dhaka University Institutional Repository

একুশ শতকের বয়স হলো পনের (১৫)। বেইজিং এ অনুষ্ঠিত চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনের পর ২০ বছর চলে যাচ্ছে। আরও পিছন ফিরে তাকালে বিশ্ব নারী বর্ষ (১৯৯৫) এর বয়স হতে চলেছে ৪০। 'নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণ সনদ' জাতিসংঘ থেকে পাশ হয় ১৯৭৯ সালে। 'নারীর অধিকার মানবাধিকার' এই ধারাটিও যুক্ত হয় মানবাধিকার সনদে (১৯৯৩)।
এসব আর্ন্তজাতিক-বিশ্ব নারী সম্মেলনগুলোতে নারীর সম-অধিকার-মানবাধিকার বিষয়ে আলোচনা-পর্যালোচনায় পুরুষ-পুরুষতন্ত্র-আইন-রাষ্ট্র-পরিবার-সমাজ-শিক্ষা-সংস্কৃতি এবং অর্থনীতি গুরুত্ব পায় সমানভাবে।

বিশ্ব ইতিহাস থেকে জানা যায়, নারীর পক্ষে এবং পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই করছেন নারী। অন্যপক্ষে নারীর বহু সংগ্রামী-ইতিবাচক ভূমিকা ও অবদানের তথ্য ইতিহাসে উপেক্ষিত। রাতের সব তারাই দিনের আলোতে লুকিয়ে থাকে, তেমনি লুকিয়ে থাকে নারীর কীর্তি।

ফরাসী ইউটোপীয়-সমাজতন্ত্রী শাঁল- ফুরিয়ে,যিনি একজন পুরুষ(১৭৭২-১৮৩৭) প্রথম বলেছিলেন, 'নারীর মর্যাদা হচ্ছে সামাজিক ন্যায় বিচারের ব্যারোমিটার'। নারীর দাসত্ব-শৃঙখলিত জীবনের শুরু কবে, সে বিষয়ে আঠারো শতকের সমাজতান্ত্রিক অগাস্ট বেবেল (১৮৪০-১৯১৩) (তিনিও একজন পুরুষ) জানিয়েছেন যে নারীই প্রথম মানুষ যারা পুরুষের বশ্যতা ও দাসত্বের বন্ধন স্বীকার করেছিল, দাসপ্রথারও আগেরও দাসত্বের শৃঙ্খল পরেছে নারী।[১১]

তবে সামাজিক-পারিবারিক-সাংস্কৃতিক- রাজনৈতিক ক্ষেত্রগুলোতে নারীর পক্ষে পুরুষ- এর লেখনী, কণ্ঠস্বর, সংগ্রাম, ভূমিকা ও অবদান বিষয়ে জানার জন্য ১৯৭০ এর দশক থেকে আজ অবধি বাঙ্গালি সমাজভিত্তিক, বাংলাদেশভিত্তিক অনুসন্ধান, গবেষণা, সাক্ষাৎকার ইত্যাদি বিষয়ে ছোট-বড় কিছু

১১.bebel .august, women in the past,present and future,germany, (১৮৭৯).

কাজ করতে গিয়ে দেখা গিয়েছে, এ ক্ষেত্রে অর্জনের ভান্ডার কম নয়। আবার বড় সাফল্যের পাশাপাশি সমাজ-সংস্কৃতি-রাজনীতি ও মূল্যেবোধের পশ্চাদপসরণও দেখা যায়।[১২]

বাংলাদেশের অর্থনীতির মুলধারার কর্মক্ষেত্রগুলোতে নারীর অবদান বেড়েই চলেছে। বর্তমানে ১ কোটি ৬৮ লাখ নারী কৃষি, শিল্প, সেবা অর্থনীতির এই বৃহত্তর তিন খাতে কাজ করছেন। অর্থনীতিতে নারীর আরেকটি বড় সাফল্য হলো, উৎপাদনব্যবস্থায় নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে।

কৃষি, শিল্প, সেবা খাতে মোট কর্মজীবী নারী,

সেবা খাত	সংখ্যা
কৃষি	৯০ লাখ
শিল্প	৪১ লাখ
সেবা	৩৭ লাখ
কলকারখানা	২২ লাখ
ব্যাংক-বীমা	৭০ হাজার
গৃহকর্মী	৯ লাখ
কারখানার মালিক	২১৭৭ জন
শিক্ষকতা	৬.৫ লাখ

সামাজিক সূচকে বাংলাদেশের বিস্ময়কর সাফল্যের পিছনে নারীর অগ্রগতি বড় ভূমিকা রাখলেও ঘরের মধ্যে নারীর অবস্থা তেমন বদলায়নি। দেশের বিবাহিত নারীদের ৮৭ শতাংশই স্বামীর মাধ্যমে কোন না কোন সময়ে, কোন না কোন ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। এর মধ্যে ৬৫ শতাংশই বলছেন, তারা স্বামীর মাধ্যমে শারীরিক নির্যাতন ভোগ করেছেন, ৩৬ শতাংশই যৌন

১২. প্রথম আলো, ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের ভূমিকা কতটা ইতিবাচক, ২৭ মার্চ,২০১৫

নির্যাতন, ৮২ শতাংশ মানসিক এবং ৫৩ শতাংশ নারী স্বামীর মাধ্যমে অর্থনৈতিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। সরকারী সংস্থা বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বুর্যো (বিবিএস) দেশে প্রথমবারের মতো নারী নির্যাতন নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে জরিপ চালিয়েছে।'ভায়োলেন্স অ্যাগেইন্স উইমেন সার্ভে ২০১১' নামের এই জরিপে নারী নির্যাতনের এই ধরনের চিত্র উঠে এসেছে। গতবছর ২০১৪ এর ডিসেম্বর এই প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়।[১৩]

একুশ শতকের চলতি দশকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের এবং রাজধানীর কবি, সাহিত্যিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক পুরুষ ব্যক্তিত্ব নারীর পক্ষে লিখছেন, বলছেন, যোগাযোগমাধ্যমে প্রচার করছেন। সন্দেহ নেই, সামগ্রিক বিচারে এসব কর্মকাণ্ড নারীর সামাজিক অবস্থানকে সংহত করছে। কিন্তু যখন দেখি ঘরে-বাইরে নারী নির্যাতনের শিকার হচ্ছে এবং সমাজে অপরাধের পরিধি বেড়ে চলেছে। তখন ভাবনার জগতে আঘাত লাগে।[১৪] এ ভাবনার জগতের আঘাত থেকেই, অনুসন্ধিৎসু মনের পিপাসা থেকে জানতে চাই, শুধু কি সমাজের নিম্ন শ্রেণীর নারীরা এর শিকার হচ্ছেন। নাকি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে গুটি কয়েক মেয়ে শিক্ষিত হয়ে উঠছে তারাও এ দলে।

আত্মমর্যাদা, আত্মপরিচয় ও ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার একবিংশ শতকের পৃথিবীর একজন স্বাধীন নাগরিকের একটি মানবিক অধিকার- এ অধিকার পালন করতে পারাই ক্ষমতায়ন। কাগজে কলমে পৃথিবীর বেশিরভাগ গণতান্ত্রিক দেশে এ অধিকার পালনের কথা উল্লেখ থাকলেও সত্যিকার অর্থে বহু নারী এ অধিকার থেকে বঞ্চিত। প্রচলিত চিন্তা ধারায় বলা হয়- শিক্ষা ছাড়া নারীর ক্ষমতায়ন সম্ভব নয়- কথাটির সত্যতা নিশ্চয় আছে- তবে ক্ষমতায়ন বিষয়টি এর চেয়ে আরো অনেক বেশী কমপ্লেক্স । প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ক্ষমতায়নের একটি প্রধান অংশ ও শর্ত হতে পারে; তবে গোটা

১৩.প্রথম আলো , নারী ঘরেই বেশি নির্যাতিত,নারী নির্যাতন নিয়ে সরকারের প্রথম জরিপ, ,২৩ জানুয়ারি২০১৫.
১৪.প্রথম আলো,ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের ভূমিকা কতটা ইতিবাচক? ২৭ মার্চ,২০১৫

Dhaka University Institutional Repository

সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি এর সাথে জড়িত। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি পারিবারিক বিশ্বাস ও রীতিনীতি থেকে তৈরী হয়। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও আমাদের মাঝে মিল না হলে মানুষের স্বপ্নের মৃত্যু হয়- আত্মমর্যাদা আর ব্যক্তিস্বাধীনতা আহত হয়। এদিক থেকে চিন্তা করলে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা যেমন নারীকে উন্নয়েনর নতুন স্তরে নিয়ে যায়, নতুন চাওয়া পাওয়ার স্বপ্ন দেখায়- তেমনি তাকে তার ক্ষমতায়নের পথে নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি এনে দাঁড় করায়। পরিবর্তিত সামাজিক পরিবেশে এ চ্যালেঞ্জ একটি নতুন মাত্রা পায়।[১৫]

বাংলাদেশের সমাজে নারী বেগম রোকেয়ার আমল থেকে অনেক এগিয়ে এসেছে ঠিকই কিন্তু এখনো এ দেশের নারীরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে নারী নির্যাতনের স্বীকার হয়। আবার যথাযথ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রাপ্তির পরও অনেক নারীকে কর্মজীবন বির্সজন দিতে হচ্ছে পরিবারকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য। সৃষ্টির সময় থেকে নারী বির্সজনের হাতিয়ার রূপে ব্যবহৃত হয়ে আসছে আমাদের সমাজে।

১.৪.গবেষণার লক্ষ্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রীদের সামাজিক প্রেক্ষাপট অনুসন্ধান।

১.৫.গবেষণার উদ্দেশ্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের -

১.৫.১.পারিবারিক বসবাসের স্থান (শহর ও গ্রাম) যাচাই।

১.৫.২.পারিবারিক শ্রেণীগত প্রেক্ষাপট অনুসন্ধান করা।

১.৫.৩.পিতা-মাতার আর্থ–সামাজিক–সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ চিহ্নিত করা

১.৫.৪.উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে সামাজিক প্রেক্ষাপটের প্রভাব যাচাই।

১.৬.গবেষণা প্রশ্ন

১.৬.১.ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের শহর ও গ্রামীণ প্রেক্ষাপটের অনুপাত কেমন?

১.৬.২.ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের শ্রেণীগত অবস্থান কিরূপ?

১.৬.৩.তাদের পিতা-মাতার আর্থিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, নৈতিকতা ও মূল্যবোধের বৈশিষ্ট্যসমূহ কী ধরনের?

১.৬.৪.তাদের শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে সামাজিক প্রেক্ষাপটের প্রভাব কিরূপ?

১.৭.গবেষণার প্রত্যয়সমূহের সংজ্ঞা

১.৭.১.শিক্ষা ও সামাজিক শ্রেণীর বৈষম্যঃ

বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থা দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত। একদিকে নিম্নবিত্ত, অন্যদিকে বিত্তশালী শ্রেণী ।যে কোন সমাজ ব্যবস্থায় একটা ব্যবধান সব সময়ই বিরাজমান। কিন্তু বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে যে তীব্র ফারাক গড়ে উঠছে, তা অবশ্যই আশঙ্কাজনক। যারা গরিব, তারা আরো গরিব হচ্ছে, আর ধনীরা অর্থবিত্তে আরো ফুলে-ফেঁপে উঠছে। বাংলাদেশের সমাজ কাঠামোয় যে বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে, তার অন্যতম কারণ এ দেশের সমাজ ব্যবস্থা। শুরু থেকেই এ দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় একটি গলদ রয়ে গেছে।

সময় সময় শিক্ষা কাঠামো বদলেছে। বদলটা হয়েছে উপরিকাঠামোয়। সত্যিকার অর্থে কোন বদল হয়নি। সেই ব্রিটিশ আমল থেকেই শিক্ষাব্যবস্থা প্রধানত স্বচ্ছল শ্রেণীর আওতাভুক্ত। ব্রিটিশরা এ দেশে যে শিক্ষাব্যবস্থা চালু করে, তার সুফল পেয়েছে এদেশে বসবাসরত ব্রিটিশ পরিবারের সন্তান, নবাব পরিবার এবং ব্রিটিশদের সঙ্গে সম্পৃক্ত এক শ্রেণীর পরগাছা। দেশভাগের পর পাকিস্তান আমলে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার মাধ্যমে এ অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভাষা বাংলা উপেক্ষা করার মাধ্যমে দারুণভাবে অবহেলা দেখানো হয়। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হলেও শিক্ষা-দীক্ষায় খুব বেশি এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর শিক্ষাক্ষেত্রে পরিবর্তনের তেমন হাওয়া লাগেনি। প্রতিনিয়ত শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তনের কারণে একটা বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে। আর এ বৈষম্যের অন্যতম কারন বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা মূলত তিনভাগে বিভক্তঃ ইংলিশ মিডিয়াম, বাংলা মিডিয়াম ও মাদরাসা শিক্ষা। ইংরেজি মিডিয়াম শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায়। স্বচ্ছল পরিবারের সন্তানরা ইংলিশ মিডিয়ামে লেখাপড়া করে। মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানরা লেখাপড়া করে বাংলা মিডিয়ামে। তবে এ ক্ষেত্রে শহর ও গ্রামের মধ্যেও পার্থক্য বিদ্যমান।

নিম্নবিত্তদের প্রধান অবলম্বন মাদরাসা শিক্ষা। শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারি,বেসরকারি, ধর্মীয়সহ বিভিন্ন ধরনের যে ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, তা শ্রেণীগত ব্যবধান ও বৈষম্যকে বাড়িয়ে দিচ্ছে। শিক্ষাক্ষেত্রে মেয়েরাও অনেক পিছিয়ে আছে। সব মিলিয়ে বাংলাদেশের শিক্ষাখাত খুব বেশি উন্নত নয়। দেশের প্রায় ৫৫ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে রাজধানী ঢাকা ও জেলা শহরের স্কুলগুলোকে বাদ দিলে অধিকাংশের অবস্থা শোচনীয়। সর্বজনীন ও মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা এখন অবধি নিশ্চিত করা যায় নি। শিক্ষার প্রাথমিক ভিতটা গড়ে ওঠে নিচের পর্যায়ে।

প্রাথমিক অবস্থা যেখানে মোটেও আশানুরূপ নয়, সেখানে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে অবস্থা খুব বেশি আশাব্যঞ্জক হওয়ার কথা নয়। দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। একসময় প্রাচ্যের 'প্রাচ্যের অক্সফোর্ড' হিসেবে খ্যাত এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তীব্র আবাসিক সংকট বিদ্যমান। পর্যাপ্ত চেয়ার-টেবিল নেই। বিছানা পেতে ঘুমানোর জায়গা নেই। ৪ জনের জায়গায় ১৪ জনকে ঠাসাঠাসি করে থাকতে হয়। এমনকি কমনরুম ও ডাইনিং রুমে শিক্ষার্থীরা গাদাগাদি করে থাকে। অথচ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়াটা সহজ ব্যাপার নয়।

দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় 'শিক্ষা ও সামাজিক বৈষম্য' কলামের মাধ্যমে গবেষক জানতে পেরেছে যে,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শতকরা ১৫ জন ভর্তি হতে পারে। তাছাড়া রাজনৈতিক দল ও তাদের ছাত্র সংগঠনের প্রভাবে দলীয়মনা ছাত্রদের ভর্তি করতে হয়। ফলে মেধাবী ছাত্রদের ভর্তির সংখ্যা আরো হ্রাস পায়। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে মূলত শহরের অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল পরিবারের সন্তানেরা সুযোগ পায়। দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তেমন সুযোগ সুবিধা পায় না। প্রতিবছর টিউশন ফি দেয়ার মতো সামর্থ্যে অনেক মেধাবী ছাত্রের নেই। ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশে প্রথম প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় অনুমতি দেয়ার পর শিক্ষাখাতে বৈষম্য নিয়ে বিতর্কের সূত্রপাত ঘটে।

দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় 'শিক্ষা ও সামাজিক বৈষম্য' কলাম অনুসারে, উল্লেখ্য যে, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় ব্যয়বহুল ও মূলত এলিটদের জন্য। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে টিউশন ও ফি কমপক্ষে

৩৫০০ডলার,তবে টিউশন ফি বিশ্ববিদ্যালয়ভেদে বিভিন্নতা রয়েছে। যা খুব কম ছাত্রের পক্ষে বহন করা সম্ভব। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়ারা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে না যাওয়ায় সাধারণতঃ অপেক্ষকৃত গরিব ছাত্ররা পড়ালেখার সুযোগ পেয়ে থাকে।

কিন্তু ভিন্ন মতাবলম্বীরা বলেন, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়াদের সঙ্গে অন্যদের একটা ব্যবধান গড়ে উঠেছে। এ দেশের মাটির সঙ্গে তাদের তেমন সম্পর্ক নেই। দেশ ও দেশের মানুষ তাদের কাছে গুরুত্ব পায় না। যে কারণে দেশের উন্নতি অগ্রগতি নিয়ে তারা ভাবেনও না। সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে শিক্ষা ও বুদ্ধিভিত্তিক চর্চাটা অপরিহার্য। শিক্ষার আলো বাতাস থেকে বঞ্চিত মানুষেরা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারে না। উন্নয়নশীল দেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা ন্যায়বান সমাজ গঠনের শক্তিশালী মাধ্যম।

বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীলদেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা সমাজ গঠনের শক্তিশালী মাধ্যম।এ দেশে অর্থনৈতিক সাহায্য ছাড়া নিম্নবিত্ত শিক্ষার্থীদের পক্ষে উচ্চশিক্ষা চালিয়ে যাওয়া কঠিন। নিম্নবিত্ত ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া মেধাবী শিক্ষার্থীদের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সমান সুযোগ- সুবিধা দেয়া হলে তারা সমাজে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমতা নিয়ে আসতে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে পারে।

শিক্ষা কেনা-বেচার পণ্যে নয়- এটা জ্ঞান সৃষ্টির কেন্দ্র। তাছাড়া শিক্ষা সুযোগ নয়, অধিকার। শিক্ষাখাতে মৌলিক সুযোগ সুবিধা দেয়া না হলে শিক্ষা চলে যাবে উচ্চবিত্তদের হাতে। সমাজে বৈষম্য বাড়বে। বাড়বে অস্থিরতা।

এমনিতেই শহর ও গ্রামের শিক্ষার মান এক নয় এবং সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে ব্যবধান গড়ে ওঠায় বৈষম্য বাড়ছে বিত্তবান বিত্তহীনদের মধ্যে। বিদ্যমান বৈষম্য দূর করাই যেখানে কঠিন,

সেখানে নতুন করে যাতে বৈষম্য সৃষ্টি না হয়, সে জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। আর এ ক্ষেত্রে শিক্ষাব্যবস্থা ঢেলে সাজানোই উত্তম পন্থা। [১৫]

১.৭.২.পরিবারের কার্যাবলীঃ

এক যুগে পরিবার যে কাজ সম্পন্ন করে অন্য যুগে পরিবারের পক্ষে সে কাজ করা অসম্ভব হতে পারে। এমন কি সে কাজ করার প্রয়োজন নাও হতে পারে। এক পরিবেশে পরিবারকে যেসব কাজ করতে হয় অন্য পরিবেশে পরিবারকে সে সব কাজ করতে হয় না। আমাদের কৃষিভিত্তিক গ্রাম্য সমাজে আজও অনেক পরিবার যৌথভাবে বসবাস করে এবং সে সব পরিবারের অন্যতম কাজ কৃষিকাজ ও কৃষি উৎপাদন এর উপরেই ভিত্তি করে যৌথ পরিবার টিকে আছে। কিন্তু ঢাকার মত শহরে সে পরিবেশ আর নাই। ঐ কৃষিভিত্তিক পরিবেশ থেকে এসে সে সব পরিবার ঢাকাতে অণু পরিবার পরিণত হচ্ছে। সে সব পরিবারের পক্ষে পূর্বের মূল্যবোধ ত্যাগ মুশকিল হয়ে পড়ছে।

১.৭.৩.শিক্ষা ও ধর্মীয় কাজ ঃ

উন্নত দেশেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে এ ধরনের আদর্শ পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব হয় নাই। অন্য দিকে একথাও সত্য যে, বহু পরিবারে শিশুর মনকে সুষ্ঠুভাবে গড়ে তুলতে সক্ষম এমন সুষ্ঠু পরিবেশ নাই। বিশেষ করে পাশ্চাত্যে বহু পরিবার মাদকতার অভিশাপে কবলিত। ঐ ধরনের পরিবেশে কোন শিশুই সুস্থভাবে গড়ে উঠতে পারে না। অসুস্থ পারিবারিক পরিবেশ থেকে দূরে বোর্ডিং স্কুলে শিশু যদি দায়িত্বশীল সহানুভূতিসম্পন্ন শিক্ষক ও শিশু বিশেষজ্ঞের যত্নে শিক্ষিত ও বড় হয়। শিশুর জন্য তা মঙ্গলজনক বৈকি।[১৬]

১৫দৈনিক সংবাদ: শিক্ষা ও সামাজিক শ্রেণীর বৈষম্য,১৫ জুন ২০০৩,

১৬.আলম. জাহেদ. খান, থিসিস নংঃ২৭১, শিরোনামঃ গ্রাম ও শহরের নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের আর্থ- সামাজিক অবস্থা ও গণিত বিষয়ে তাদের অর্জিত জ্ঞানের তুলনামূলক পর্যালোচনা ।

১.৭.৪.ব্যক্তিত্বের বিকাশ

ব্যক্তিত্ব স্ফূরনের সম্ভবনা জন্মের পরপরই দেখা দেয়। টমাস এবং গবেষকবৃন্দ উল্লেখ করেছেন যে, ব্যক্তির মেজাজ পারিপার্শ্বিকতার সমন্বয়ে ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। কারণ এ সময়ে ব্যক্তিত্বের যে ভিত্তি রচিত হয় ভবিষ্যতে সেই অনুযায়ী ব্যক্তিত্বের গুণাবলি পরিপূর্ণতা লাভ করে। জন্মগত ব্যক্তিত্ব গুণাবলির স্থিতিশীলতা সম্পর্কে কয়েক বছরব্যাপী বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনা করে দেখা গিয়েছে যে, জীবনের সূচনায় ব্যক্তিত্বের যে ছাঁচ প্রতিষ্ঠিত হয় শিশু বড় হয়েও তা অপরিবর্তনীয় থাকে। এ সর্ম্পকে টমাস ও সহ গবেষকরা বলেছেন যে বড় হওয়ার সাথে সাথে পারিপার্শ্বিক ঘটনা গুণাবলীর তীব্রতা বৃদ্ধি অথবা দুর্বল করে দিতে পারে।

ব্যক্তিত্বের মূল বিষয়টি হল আত্মধারণা। সেটি সবসময় এক রকম থাকে না। শিশু যত বড় হতে থাকে আত্মধারণার পরিবর্তন খুব কঠিন হয়ে ওঠে। সে সময় গুণাবলির পরিবর্তন সামগ্রিক ব্যক্তিত্বের ভারসাম্য নষ্ট করে দেয়। সে কারণে শিশুর প্রাথমিক জীবনের অভিজ্ঞতাসমূহ ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে পরিচিত।[১৭]

১.৭.৫.পারিবারিক সর্ম্পকের ক্ষেত্রে বিপত্তি

শিক্ষার্থীর সামাজিক জগত শুরু হয় পরিবার থেকে। অতএব মা-বাবা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যের সাথে প্রতিকূলতা সৃষ্টি হলে সূদুরপ্রসারী মানসিক বিপত্তি দেখা দেয়।

পরিবারের সাথে ছেলেমেয়ের সম্পর্ক তার পড়াশুনা এবং স্কুলের প্রতি মনোভাবের উপর প্রভাব বিস্তার করে। সুখী, সমৃদ্ধ পারিবারিক সম্পর্ক ছেলে বা মেয়ের মনে পড়াশুনার অনুপ্রেরণা যোগায়। অন্যদিকে শিথিল পারিবারিক সম্পর্কের ফলে শিক্ষার্থীর মধ্যে মানসিক চাপের সৃষ্টি হয়। মানসিক অস্থিরতার জন্য ছেলে-মেয়েরা পড়াশুনায় মনোযোগ দিতে পারে না।

---

[১৭] বানু .সুলতানা, বিকাশ মনোবিজ্ঞান, , ১৯৯৭ , বাংলা একাডেমী, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

মা-বাবার সাথে শিক্ষাক্ষীর সম্পর্ক তার সামাজিক অভিযোজনকে প্রভাবিত করে। মা-বাবার সাথে শিক্ষার্থীর সহজ সম্পর্ক অন্য ব্যক্তির সাথে সহজ সম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করে। কিন্তু এর অভাবে অন্য ব্যক্তির সাথে ছেলে-মেয়েরা সহজ সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে না।

আবার পরিবারে শিক্ষার্থী যে ভূমিকায় আচরণ করতে শেখে বাইরের পরিবেশেও ঠিক সেরকম আচরণ করে। এর ব্যাখ্যাস্বরূপ বলা যায় যে, পরিবারে আচরন ধারা এবং ভাইবোনের সাথে সম্পর্কের প্রকৃতি বাইরের সমবয়সী অন্যান্যদের মেলামেশার ভিত্তিস্বরূপ।

একজন শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব বিকাশে পারিবারিক সম্পর্ক যত গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে তেমনভাবে জীবনের আর কোন দিকে করে না। পরিবারে বিভিন্ন ব্যক্তি তাদের প্রতি যে মনোভাব পোষণ করে তা তাদের ব্যক্তিত্বের উপর প্রভাব বিস্তার করে। [১৮]

১.৭.৬.প্রথা

ম্যাকাইভার এর মতে, প্রথা হচ্ছে সমাজ স্বীকৃত আচরণবিধি এবং কার্যপ্রণালী।

প্রথাকে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়।

- নিত্যদিনের স্বাভাবিক কাজকর্ম
- নিত্যদিনের কাজকর্মের পন্থা প্রণালী
- পারস্পারিক সামাজিক আচরণ এবং ক্রিয়ার মধ্যে প্রতিফলিত সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ।

  প্রথার চারটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যথা:
- প্রথা সমাজে সর্বদা বিদ্যমান;
- প্রথা মূলত সামাজিক;

১৮ বানু.সুলতানা ,বিকাশ মনোবিজ্ঞান, ১৯৯৭,বাংলা একাডেমী,ঢাকা।

- প্রথায় মূল্যবোধের প্রশ্ন বর্তমান;
- প্রথা সামাজিক অনুশাসন বা সামাজিক বিধানের নামান্তর ।

প্রথাকে বলা হয়েছে,

An habitual form of behaviour largely followed in society.

উল্লেখ্য যে, অভ্যাস বা প্রথা এক নয় ।চা-পান, ধূমপান, ইত্যাদি অভ্যাস বটে, তবে তা প্রথা নয়। কেননা এসব অভ্যাস নেহায়েত ব্যক্তিগত বিষয়। এগুলো পালনে সামাজিক বাধ্যবাধকতা নেই। অপরপক্ষে,প্রথা ব্যক্তিগত বিষয় নয়। এর একটি সামাজিক চরিত্র রয়েছে। প্রথা পালনে কিছুটা সামাজিক বাধ্যবাধকতা আছে বৈ-কি। বাধ্যবাধকতা না থাকলেও অন্তত সমাজ আশা করে সমাজস্থ ব্যক্তিরা প্রথা অভ্যস্ত হোক।

অবশ্য অভ্যাসের সাথে প্রথার মিল রয়েছে। কেননা,প্রথাগুলো অচেতনভাবে অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। আবার অভ্যাসগুলো ক্রমে প্রথার রূপ নিতে পারে। তবে, এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট।

১.৭.৭.সংস্কৃতি

সমাজের সদস্য হিসেবে আমরা যা অর্জন করি তা সংস্কৃতি। এ ধারণাটির সাথে সম্পর্কযুক্ত যে সংজ্ঞাটি বহুল আলোচিত সেটা দিয়েছেন বৃটিশ নৃবিজ্ঞানী টেইলর (E.B.Tylor)Zuvi primitive Culture গ্রন্থে। তিনি বলেন,

Culture is that complex whole which includes knowledge, belief,art, law,custom, and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society.

সংস্কৃতি যেহেতু জীবনযাত্রা প্রণালী, আর জীবনযাত্রা প্রণালী মানুষের পেশার উপর নির্ভরশীল, তাই বলা চলে যে, সংস্কৃতি পেশার সাথে ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কযুক্ত। পেশার বিভিন্নতা সংস্কৃতির বিভিন্নতার জন্য দায়ী। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে যদিও ভাষা, নরবংশ, ভৌগলিক অবস্থান, ইতিহাস ও ঐতিহ্যগত ঐক্যের কারণে আমাদের সমাজের মধ্যে মূলত সুদূরপ্রসারী ও ব্যাপক সাংস্কৃতিক ঐক্যতান ও মিল রয়েছে। কৃষি পেশাজীবীর জীবনপ্রণালী ও উচ্চ বিত্তবান ব্যবসায়ী শিল্পপতির জীবন প্রণালীর মধ্যে পার্থক্য আরও বেশি সুস্পষ্ট। তাদের প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন বস্তুগত ও অবস্তুগত সংস্কৃতি রয়েছে। ঘর-বাড়ি, আসবাবপত্র, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদিতে যেমন এ পার্থক্য সুস্পষ্ট, তেমন তাদের রুচি ও ধ্যান ধারণায় এ পার্থক্য সহজেই অনুমেয়। তারা ভিন্ন ধরণের সংগীত, কেচ্ছা-কাহিনী, নভেল-নাটক বা ছায়া-ছবিতে আকৃষ্ট। সর্বোপরি তাদের দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গিতে রয়েছে পার্থক্য। বস্তুগত পেশাগত পার্থক্য তথা অর্থনৈতিক বৈষম্যই এর মূল কারণ। অন্যান্য কারণের মধ্যে অবশ্য শিক্ষা, মেধা, রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধার পার্থক্য বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়।

সমাজে বসবাস করতে গিয়ে মানুষ সমাজের আচার-আচরণ,ধ্যান-ধারণা,মূল্যবোধ ইত্যাদি অনুকরণ করে। সমাজীকরণ প্রক্রিয়ার সমাজের সদস্য হিসেবে মানুষ সমাজ থেকে যা কিছু অর্জন করে তা তার সংস্কৃতি। এজন্যই বলা হয় যে, সংস্কৃতি হচ্ছে ব্যক্তির অর্জিত আচরণ। সংস্কৃতি এক পুরুষ থেকে পরবর্তী পুরুষে সামাজিক উত্তরাধিকার সূত্রে বর্তিয়ে থাকে। অর্থাৎ আমরা পূর্ব পুরুষের সংস্কৃতি সামাজিক পরিমন্ডলে ধীরে ধীরে উত্তরাধিকার সূত্রে গ্রহণ করি। এই গ্রহণ প্রক্রিয়া আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক, সচেতন অবচেতনে সমাধা হয়।

দেহ অভ্যন্তরের জৈবিক-ব্যবস্থা প্রাণীকে যা দান করে সমাজজীবনে মানুষকে সংস্কৃতি তাই দান করে। কেননা প্রাণী পরিচালিত হয় তার জৈবিক ব্যবস্থা ও চাহিদা অনুযায়ী [১৯]।

১৯.সমাজবিজ্ঞান পরিচিতি, ডক্টর মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান,প্রকাশনী,হাসান বুক হাউস,ঢাকা,জানুয়ারী১৯৯৮

১.৭.৮. গবেষণার সীমাবদ্ধতা

সামাজিক প্রেক্ষাপট বিষয়টি একটি সামগ্রিক বিষয়। সামাজিক প্রেক্ষাপট ধারণাটির সাথে পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, নৈতিক, সাংস্কৃতিক বিষয়গুলো জড়িত।ছাত্রীদের সামাজিক অনুসন্ধানের জন্য প্রশ্নমালা উপকরণটি গবেষক ব্যবহার করেছে।প্রশ্নমালা উপকরনটির মাধ্যমে যাতে ছাত্রীদের সামাজিক প্রেক্ষাপটের সঠিক তথ্য উঠে আসে এ কারনে প্রশ্নপত্রটিকে কয়েকটি অংশে বিভক্ত করা হয়েছে এবং শেষ অংশটিতে ছাত্রীদের মতামত যাচাই করা হয়েছে। গবেষক এর নমুনা অঞ্চল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষক নিজে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী হওয়া স্বত্তেও গবেষণাকালীন সময়ে নিজ গৃহ মিরপুরে অবস্থান করায় যাতায়াত সমস্যা ছিল গবেষকের প্রধান অসুবিধা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩৩৫০০ হওয়ায়, পরবর্তীতে নিঃসম্ভবনা নমুনায়নের মাধ্যমে ২০০ জন ছাত্রীদের মধ্যে ১৭০ জন ছাত্রীর নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। গবেষণা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে গবেষককে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে -

- ✓ ছাত্রীদের মধ্যে অনেকে উত্তরদানে অনীহা প্রকাশ করে।
- ✓ অনেক ছাত্রীর মতে কিছু প্রশ্নের উত্তর একাধিক হতে পারে।
- ✓ পরিবারে খাবার গ্রহণের প্রশ্নটি ভিন্নভাবে করা যেতে পারে বলে মন্তব্য আসে।
- ✓ উন্মুক্ত প্রশ্নের উত্তর প্রদানে ছাত্রীদের অনাগ্রহ দেখা যায়।
- ✓ অনেক ছাত্রী পরীক্ষা আছে বলে মন্তব্য করে গল্পে আগ্রহী হয়ে ওঠে।

গবেষণাটিতে তথ্য সংগ্রহের জন্য গবেষকের বিভিন্ন ছাত্রী হলে রাত্রী যাপনের প্রয়োজন ছিল।কিন্তু গবেষক সেসময় আবাসিক শিক্ষার্থী না হওয়ায় তাকে নিজ আবাসস্থল মিরপুর থেকে প্রতিদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়েছে, যা গবেষকের জন্য অনেক কষ্টসাধ্য ছিল। গবেষক এই গবেষণাটির জন্য কেবলমাত্র প্রশ্নমালা উপকরণটি ব্যবহার করেছে।পরবর্তী সময়ে এই বিষয়ের গবেষণায় প্রশ্নমালার পাশাপাশি সাক্ষাৎকার ব্যবহার উপকরণ ব্যবহার করলে তথ্যসমূহের যর্থাথতা

যাচাই করা আরও ভালভাবে সম্ভব হবে। যেসব প্রশ্নে ছাত্রীরা অনাগ্রহ প্রকাশ করে সেগুলোকে কিভাবে আকর্ষণীয় করা যায় সে বিষয়ে গবেষণীয় মাধ্যমে আরও চিন্তাভাবনার প্রয়োজন রয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় : গবেষণার পদ্ধতি ও কৌশল

২.১ *গবেষণায় অনুসৃত পদ্ধতি*

২.২ *গবেষণার রূপরেখা*

২.৩ *বিষয় নির্বাচন*

২.৪ *প্রস্তুতিপর্ব ও পর্যালোচনা*

২.৫ *গবেষণার প্রকৃতি ও ক্ষেত্র*

২.৬ *নমুনা নির্বাচন ও নমুনায়ন কৌশল*

২.৭ *উপাত্ত সংগ্রহের সময়কাল*

২.৮ *তথ্য সংগ্রহপত্র তৈরি*

২.৯ *উত্তর পদ্ধতি*

২.১০ *উপাত্ত সংগ্রহ*

২.১১ *উপাত্ত বিন্যাস*

২.১২ *তথ্য বিশ্লেষণ প্রাক্রিয়া*

২.১৩ *সিদ্ধান্ত ও সুপারিশ*

দ্বিতীয় অধ্যায়

গবেষণার পদ্ধতি ও কৌশল

২. গবেষণায় অনুসৃত পদ্ধতি

যে কোন কাজ সুষ্ঠু সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে করার জন্য প্রয়োজন রয়েছে একটি সুপরিকল্পিত ও যথার্থ কার্যপদ্ধতির যা গবেষণা কাজকে সুষ্ঠু, সুন্দর ও ধারাবাহিকভাবে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে সহায়তা করে থাকে।

"ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রীদের সামাজিক প্রেক্ষাপট অনুসন্ধান।"

শীষক গবেষণাটি বাস্তবভিত্তিক গবেষণা। উল্লিখিত গবেষণায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের নমুনা অঞ্চলের অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। সর্বাঙ্গিন আলোচনা সামাজিক প্রেক্ষাপট নিয়ে তাই শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের নমুনায় রাখা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দেশের উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায়ের দুই তৃতীয়াংশের প্রতিনিধিত্ব করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা আজ সমাজ ও রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত। তারা অনেক ক্ষেত্রে পুরুষদের সমমর্যাদায় বা কোথাও কর্মজীবনে পুরুষদের চেয়ে সফল ও ঈর্ষনীয় স্থানে অবস্থান করছেন। এ সকল বিষয় কে সামনে রেখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের সামজিক প্রেক্ষাপট অনুসন্ধানের বিষয়টিকে গবেষক তার গবেষণার বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছেন। গবেষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদ, ইনস্টিটিউটে অধ্যয়নরত প্রায় ৩৩৫০০ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ২০০ জন ছাত্রী কে নিঃসম্ভবনা নমুনায়নের মাধ্যমে নির্বাচন করেছেন[২০]। বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রীষ্মকালীন ছুটিকে সামনে রেখে ছাত্রীদের অনুপস্থিত থাকার বিষয়টি বিবেচনা করে প্রশ্নমালা প্রণয়নের পর ১৭০ জন ছাত্রীর নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। যাদের নমুনায়ন হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে তাদের অধ্যয়নরত বিষয়, কতজন শিক্ষার্থী একই বিষয় থেকে প্রশ্নমালা পূরণ করেছে সে বিষয়ে নিম্নে তথ্য উপস্থাপন করা হলঃ

২০.ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,WikiEducator

২.১.সাধারণ তথ্য

বিভাগ	সংখ্যা
কলা অনুষদ- ৫৩ জন	সংগীত -৫ জন, বাংলা -৯ জন, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি-৬ জন ইংরেজি-৮ জন, থিয়েটার এন্ড পারফরমেন্স-২ জন, আরবী বিভাগ -১ জন দর্শন ৮ জন, ইতিহাস-৬ জন, বিশ্বধর্ম ও সংস্কৃতি-৩ জন সংস্কৃত-২ জন, ইসলাম শিক্ষা-৩ জন
বিজ্ঞান অনুষদ- ১৫ জন	পরিসংখ্যান-১ জন, গনিত-৪ জন, কম্পিউটার-১ জন,কেমিস্ট্রি-১ জন ,ভূতত্ব-১ জন, ভূগোল এন্ড পরিবেশ-১ জন, পদার্থবিজ্ঞান-৫ জন, পরিসংখ্যান-১ জন
আইন অনুষদ- ১ জন	আইন ১ জন
সামাজিক অনুষদ- ৩৮জন	রাষ্ট্রবিজ্ঞান-৮ জন,অর্থনীতি-২ জন,তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা-১জন, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা-৪ জন, লোক প্রশাসন- ৬ জন, সমাজ বিজ্ঞান-৭ জন, ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন- ৩ জন, ওমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ- ২ জন, শান্তি ও সংঘর্ষ- ১ জন, ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট-৪ জন
বিজনেস স্টাডিজ- ৩২ জন	ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ-৫ জন, একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেম-১ জন, মার্কেটিং-১০ জন, ইনটারন্যাশনাল বিজনেস-৪ জন, ব্যাংকিং এন্ড ইন্সুরেন্স-৭ জন, ফিনান্স-৩ জন,এম.আই.এস.-২ জন
জীববিজ্ঞানঅনুষদ- ১৪ জন	মৎস্য বিজ্ঞান-২ জন, প্রাণীবিদ্যা-১ জন, বায়োকেমেস্ট্রি- ৬ জন, উদ্ভিদবিজ্ঞান-১ জন, , মনোবিজ্ঞান-২ জন, মৃত্তিকা,পানি ও পরিবেশ ২ জন,
ফার্মেসী অনুষদ- ০ জন	
চারুকলা অনুষদ- ৫ জন	৫ জন,
ইনস্টিটিউট- ১২ জন	সমাজ কল্যাণ গবেষণা-৩ জন,আই.ই.আর.-৮ জন, স্বাস্থ্য অর্থনীতি- ১ জন

২.২ *গবেষণার রূপরেখা*

গবেষণা কার্যক্রমটি পরিচালনায় যে সমস্ত পদ্ধতি ও নিয়মকানুন অনুসরণ করা হয়েছে এর বিবরণ এই অধ্যায়ে উপস্থাপন করা হলো।

২.৩ *বিষয় নির্বাচন*

উচ্চ শিক্ষাস্তর আনুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থার সর্বোচ্চ পর্যায়। এ কারণে এই স্তরটি ছাত্র ও ছাত্রী নির্বিশেষে সকল শিক্ষার্থীর জন্য সমান গুরুত্বপূর্ণ। মোট শিক্ষার্থীর তুলনায় উচ্চ শিক্ষায় মেয়েদের অংশগ্রহণের হার মাত্র এক চতুর্থাংশ। যেসব ছাত্রীরা উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত পৌঁছেছে তাদের অনেকে নানা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করেছে। তাই উচ্চশিক্ষায় অধ্যয়ন করতে আসা মেয়েদের সামাজিক প্রেক্ষাপট জানা অত্যন্ত প্রয়োজন। সামাজিক পটভূমিকার প্রথমেই আসে পারিবারিক অবস্থার বিশ্লেষণ। পিতা ও মাতার আর্থিক, শিক্ষাগত, এবং সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের প্রভাব ব্যক্তির উপর ছোট বেলা থেকেই পড়তে থাকে। এ সকল পরিবেশ পরিস্থিতি ব্যক্তির শিক্ষাজীবনের বিভিন্ন স্তর এমনকি উচ্চশিক্ষার পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছার ব্যাপারেও কতটা সহায়ক তা জানা প্রয়োজন। গবেষণা বিষয় নির্বাচনে অতীত ও বর্তমান পরিস্থিতির আলোকে বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষায় নারী সমাজের প্রধিনিধিত্বকারী সামাজিক পরিবেশ এবং তাদের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি যাচাই সর্ম্পকিত গবেষণার মাধ্যমে প্রশাসনিক ও পরিকল্পনার দিক থেকে পূর্ববর্তী শিক্ষাস্তরসমূহ ও বাস্তব পরিস্থিতি সর্ম্পকে জ্ঞান লাভের যথেষ্ট অবকাশ আছে বলে মনে করে বাংলাদেশের নারীশিক্ষার এই বিশেষ দিক নিয়ে গবেষণাকার্য পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

২.৪ *প্রস্তুতিপর্ব ও পর্যালোচনা*

গবেষণার বিষয়বস্তু নির্বাচনের পর এই বিষয়ের সাথে সর্ম্পকিত গবেষণা রিপোর্ট, জার্নাল, পুস্তক, পুস্তিকা সংগ্রহ করে ঐ গুলোর পর্যালোচনা করা হয়। এছাড়া গবেষণাকার্য পরিচালনার নিয়মবিধি

সংক্রান্ত পুস্তিকাদির সহায়তা নেয়া হয়। এরপর গবেষণার একটি পূর্নাঙ্গ রূপরেখা প্রস্তুত করে উপদেষ্টা ও গবেষণা পরীক্ষণ কমিটির সদস্যদের অনুমোদন নেয়া হয়।

২.৫ গবেষণার প্রকৃতি ও ক্ষেত্র

এই গবেষণাটি একটি বর্ণনামূলক গবেষণা। এই গবেষণাটি ধরনগত দিক থেকে প্রধানত পরিমানগত, তবে গুণগত উপাত্তসমূহ ব্যাখা করা হয়েছে। এটাকে পরিমানগত গবেষণাও বলা হয়েছে। কারণ এখানে পরিসংখ্যানিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই গবেষণার এলাকা নির্ধারণ করা হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদ ও ইনিস্টটিউট এর ছাত্রীদের ।

২.৬ গবেষণার তথ্যবিশ্ব

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত বিভিন্ন অনুষদ ও ইনস্টিটিউটের স্নাতক (সম্মান), স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্রীরা।

২.৭ নমুনা নির্বাচন ও নমুনায়ন কৌশল

গবেষকের ব্যক্তিগত সুযোগ সুবিধা যেমন নমুনাঞ্চল সম্পর্কে পূর্ব পরিচয় এবং যেখানে সরাসরি অংশগ্রহণ পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করতে বেগ পেতে হবে না, সীমিত সময়ের মাঝে এলাকায় অবস্থান করে, তথ্য সংগ্রহে সুবিধা, যোগাযোগের সুবিধা ইত্যাদির কথা বিবেচনা করে উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের নমুনা হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। গবেষণার তথ্যবিশ্ব থেকে নমুনা নির্বাচনের জন্য নিঃসম্ভাবনা নমুনায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। এই গবেষণায় গবেষক নমুনা নির্বাচনে সুবিধাজনক বা আকস্মিক নমুনায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করেছে।

২.৮ উপাত্তসংগ্রহের সময়কাল

উল্লিখিত গবেষণার প্রয়োজনীয় উপাত্তসমূহ, ২০১৫ সালের মে মাস, এই সময়ের মধ্যে সংগ্রহ করা হয়েছে।

২.৯ তথ্য সংগ্রহপত্র তৈরি

অনুমিত সিদ্ধান্তের যথার্থতা যাচাই এর লক্ষ্যে উপাত্ত সংগ্রহের জন্য একটি তথ্য সংগ্রহপত্র তৈরী করা হয়। তথ্য সংগ্রহপত্রটি ৭ টি অংশে ভাগ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহপত্রের প্রারম্ভে রয়েছে উত্তরদাতা শিক্ষার্থীগনের অধ্যয়নরত বিভাগের নাম, কোন বর্ষে অধ্যয়ন করছে,কোন ধর্মের অনুসারী তা জানার নিমিত্তে প্রশ্নাবলি লিপিবদ্ধ হয়েছে।

দ্বিতীয় অংশে, পারিবারিক বিষয়ে ৫ টি প্রশ্ন রাখা হয়েছে। যেখানে ছাত্রীদের শিক্ষাগত ও আর্থিক বিষয় (পরিবারের সদস্য সংখ্যা, শিক্ষাগত যোগ্যতা,পেশা, মাসিক আয়, আয়ের অন্যান্য উৎস)এ সংক্রান্ত প্রশ্নগুলো করা হয়।

তৃতীয় অংশে বাসস্থান সংশ্লিষ্ট প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা হয়। এখানে ছাত্রীর পিতামাতার বসবাসের স্থান, বাড়িটির ধরন, কক্ষের সংখ্যা, ইলেকট্রিসিটি, পানির উৎস, নিজস্ব যানবাহন সর্ম্পকিত প্রশ্ন লিপিবদ্ধ করা হয়।

চতুর্থ অংশে পরিবারে ভালো খাবার গ্রহণের অগ্রাধিকার, চিকিৎসা সহায়তা, কাকে বেশি অগ্রাধিকার দেয়া হয় এ সর্ম্পকে প্রশ্ন করা হয়।

যেহেতু গবেষণাটি সামাজিক প্রেক্ষাপট সংক্রান্ত। তাই গবেষক নমুনাদের সামাজিক প্রেক্ষাপট জানার জন্য সকল বিষয় অর্ন্তভুক্ত করে প্রশ্নপত্রের প্রশ্নগুলো প্রণয়ন করেছে।

পঞ্চম অংশে, রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ, পরিবারে স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করা, ভোট দেয়ার অধিকার সর্ম্পকে প্রশ্ন রাখা হয়েছে। এইসব প্রশ্নাবলি সামাজিক অবস্থান নির্ণয়ের প্রয়াশমাত্র।

ষষ্ঠ অংশে পরিবারে ধর্মীয় বিধিনিষেধ কেমন অনুসরণ করা হয় এ সর্ম্পকে প্রশ্ন রাখা হয়। সপ্তম অংশে সাংস্কৃতিক চর্চা, পরিবারে সাংস্কৃতিক চর্চায় প্রতিবন্ধকতা, পিতামাতা কতদুর পর্যন্ত পড়াশুনা করাতে আগ্রহী,উচ্চ পর্যায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণ, নারী শিক্ষায় প্রতিবন্ধকতা, বিবাহের বয়সসীমা সর্ম্পকে প্রশ্ন রাখা হয়েছে।

ছাত্রীদের ব্যক্তিগত মতামত যাচাই করার জন্য প্রশ্নপত্রের শেষ অংশে কিছু প্রশ্ন রাখা হয়। সেগুলো হল-(বিবাহের ক্ষেত্রে যৌতুক প্রদান সমর্থন, পরিবারে নারীপুরুষের ভূমিকা, চাকরিতে প্রবেশের প্রতিবন্ধকতা) এ সর্ম্পকে প্রশ্ন করা হয়।

সবশেষে, ছাত্রীদের সামাজিক পরিবেশ থেকে সহায়তা ও তাদের শিক্ষাজীবনে চ্যালেঞ্জ সর্ম্পকে তাদের মতামত যাচাই করার জন্য প্রশ্ন রাখা হয়।

তথ্যসংগ্রহপত্রটি খসড়াভাবে প্রণয়ন করে উপদেষ্টা ও গবেষণা কমিটির অভিজ্ঞ শিক্ষকগণের পরামর্শের ভিত্তিতে পরিবর্তন করা হয়। তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে পাইলট টেস্ট করা হয়। পাইলট টেস্টের সময় গবেষক বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০ জন ছাত্রীকে আকস্মিক নমুনায়ন পদ্ধতিতে নির্বাচন করে,এর মধ্যে শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট এর ৩ জন (এম.ফিল ও মার্স্টাস), মার্কেটিং এর ৩ জন(তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষ), সমাজবিজ্ঞান এর ১ জন(মার্স্টাস),পরিসংখ্যান এর ১ জন(চতুর্থ বর্ষ),সংগীত ১ জন(চতুর্থ বর্ষ), স্বাস্থ্য অর্থনীতি ১ জন(দ্বিতীয় বর্ষ)। মোট ১০ জনের নিকট থেকে পাইলটিং এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করেন। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অস্পষ্টতা পরিহার করে তথ্যসংগ্রহপত্রের চূড়ান্তরূপ দেয়া হয়।

২.১০ উত্তর পদ্ধতি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের নিকট কিছু উন্মুক্ত প্রশ্ন, কিছু নির্ধারিত প্রশ্ন ও মিশ্র প্রশ্নের দুইটি হতে পাঁচটি পর্যন্ত বিকল্প উত্তর সমন্বয়ে সাত অংশে বিভক্ত একটি প্রশ্নপত্র দেয়া হয়।

প্রশ্নাবলীর মাঝে উন্মুক্ত প্রশ্নের সংখ্যা খুব কম। অধিকাংশই নির্ধারিত ধরনের প্রশ্ন করা হয়েছে। প্রশ্নপত্রের শেষের অংশে শিক্ষার্থীদের মতামত সংক্রান্ত প্রশ্ন দেয়া হয়েছে। প্রত্যেক তথ্য প্রদানকারী তথ্য সংগ্রহপত্রের নির্দেশিত উপায়ে যে কোন বিকল্প উত্তরে টিক চিহ্ন দিয়ে তাদের মতামত ব্যক্ত করেছেন। কোন কোন প্রশ্নে একাধিক মতামত ব্যক্ত করেছেন উত্তরদাতাগণ কিন্তু বর্ণনামূলক প্রশ্নে তাদের স্ব স্ব মতামত ব্যক্ত করেছেন।

২.১১ *উপাত্ত সংগ্রহ*

ব্যক্তিগতভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের সাথে বিভিন্নসময়ে প্রত্যক্ষভাবে যোগাযোগ করে তথ্যসংগ্রহপত্রের মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়।

২.১২ *উপাত্ত বিন্যাস*

তথ্যসংগ্রহপত্রের মাধ্যমে প্রাপ্ত উপাত্তসমূহ নিম্নলিখিতভাবে পরিসংখ্যানিক কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়। প্রশ্নপত্র প্রণয়নের পর প্রাপ্ত উত্তরগুলোর প্রচুরতা বিন্যাস করা হয় এবং তাদের শতকরা হার নির্ণয় করা হয়। সবশেষে সেসব তথ্যকে গ্রাফের সাহায্য উপস্থাপন করা হয়।

২.১৩ *তথ্য বিশেস্নষণ প্রক্রিয়া*

এই গবেষণাটি একটি বর্ণনামূলক গবেষণা। এখানে তথ্যসমূহ পরিসংখ্যানিক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উপাত্ত বিশ্লেষণ করার জন্য প্রাপ্ত উপাত্তগুলোকে পরিসংখ্যানের ফ্রিকুয়েন্সি বণ্টনের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। এরপর গাণিতিক শতকরার হিসেব করা হয়েছে। গবেষণায় ব্যবহৃত প্রশ্নমালাটি ছিল মিশ্র প্রশ্ন যার কারণে উত্তরদাতা তাদের উত্তর ও উত্তরের স্বপক্ষে মতামত লিখতে পেরেছে। ফলে প্রশ্নমালার প্রশ্নসংখ্যা অনুযায়ী তথ্যসমূহকে প্রয়োজনীয় সমসংখ্যক কলাম অনুযায়ী সমসংখ্যক সারি তৈরি করে উপাত্তসমূহের বিন্যাস করা হয়েছে। এসময় পরিসংখ্যান ট্যালি , ফ্রিকুয়েন্সি ব্যবহার করা হয়েছে। পরবর্তীতে সেসব তথ্য সারণী আকারে শতকরা সংখ্যা ও শতকরা নিয়মে বিন্যাস করা হয়েছে।

২.১৪ *সিদ্ধান্ত ও সুপারিশ*

প্রাপ্ত তথ্যাদির উপর ভিত্তি করে সুনিদিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সে অনুসারে সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনা

- পুস্তক
- গবেষণাকর্ম

তৃতীয় অধ্যায়

সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনা

৩.১. সংশ্লিষ্ট পুস্তক পর্যালোচনা

জ্ঞান কোন বিচ্ছিন্ন ধারণা নয়। তার সাথে সম্পর্কিত বা আংশিক সম্পর্কিত পূর্বজ্ঞান কি আছে তা জানলে জ্ঞানের মাঝে শৃঙ্খলা আসে এবং জ্ঞানের পুনরাবৃত্তি রোধ হয়। আর যে কোন বিষয় গবেষণা করতে গেলে জ্ঞানের পুনরাবৃত্তি রোধ করার জন্য এবং গবেষণার বিষয়বস্তু সম্পর্কে ভালভাবে জানার জন্য বিষয়সংশ্লিষ্ট বইপুস্তক, গবেষণাপত্র, রির্পোটি, জার্নাল, প্রবন্ধ পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। সে লক্ষ্যে গবেষক তার গবেষণার বিষয়বস্তু নির্বাচনের পর এ সম্পর্কিত কী কী গবেষণাপত্র বা বইপুস্তক আছে তা জানার চেষ্টা করেছেন। বিভিন্ন বই-পুস্তক, গবেষণাপত্র, রিপোর্ট, জার্নাল, পত্রিকা ইত্যাদি পর্যালোচনার পর গবেষক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে " ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রীদের সামাজিক প্রেক্ষাপট অনুসন্ধান " শীর্ষক কোন গবেষণাকর্ম ইতোপূর্বে পরিচালিত হয় নি।

এরূপ গবেষণার ক্ষেত্রে এটি প্রথম প্রয়াস। বর্তমান গবেষণা শীর্ষক কোন প্রত্যক্ষ গবেষণাপত্র ও সাহিত্যের সন্ধান গবেষক খুঁজে পান নি। তবে বর্তমান গবেষণার সাথে পরোক্ষভাবে সর্ম্পকিত যে কয়টি গবেষণাপত্র, বইপুস্তক, রির্পোট, জার্নাল ইত্যাদির সন্ধান পাওয়া গেছে এ অধ্যায়ে সে সম্পর্কে সংক্ষেপে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট একটি অন্যতম বিষয় হল শিক্ষা। মধ্যযুগে শিক্ষা সাধারণ মানুষের বাস্তব জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তবে আধুনিক যুগে শিক্ষা সাধারণ মানুষের জীবন সম্পৃক্ত হতে শুরু করে এবং ধীরে ধীরে তাদের দুয়ারে পৌঁছাতে থাকে। পনের শতকে ইউরোপে সংঘটিত রেনেসাঁসের মাধ্যমে এর সূত্রপাত ঘটে।এরই ধারাবাহিকতায় আস্তে আস্তে মানুষের চিন্তা চেতনা,

কর্মকান্ড সবকিছুই পরিবর্তিত হতে থাকে। বিশ্বের মানুষের জীবনধারা বদলাতে শুরু করে, ঠিক তেমনিভাবে বাংলাদেশের মানুষের জীবনধারা, দৃষ্টিভঙ্গি,মানসিকতাও পরিবর্তিত হতে থাকে। আমরা যদি মাত্র পয়তাল্লিশ বছর পিছনে ফিরে আমাদের স্বাধীনতার পূর্বকালের সময়ের দিকে তাকাই,সেই সাথে বর্তমান সময়ের সামাজিক প্রেক্ষাপট তুলনা করি,তাহলে সামাজিক পরিবর্তনের চালচিত্র অনুধাবন করতে পারব।

স্বাধীন বাংলাদেশের বীজ বোপনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ভূমিকা অপরিসীম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাই সর্বপ্রথম মাতৃভাষায় কথা বলার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দেয়। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ ফিরে পায় তার নিজস্ব মর্যাদা,পরিচয় ও গৌরব। স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনে পুরুষের পাশাপাশি নারীর ভূমিকা রয়েছে। বাংলাদেশের পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নারীদের সামাজিক অবস্থান কিরূপ তা জানার কৌতূহল থেকে গবেষক গবেষণা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পুস্তক, পত্রিকা,ওয়েবসাইট পর্যালোচনার চেষ্টা করেছেন।

গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় হল :

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, নারী শিক্ষা, নারী শিক্ষার সূচনা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীদের পদচারণা,নারী শিক্ষার উদ্ভব ও বিকাশ এসব বিষয়।

অধ্যয়নরত ছাত্রীদের প্রেক্ষাপট আলোচনার প্রথমে গবেষক নারী শিক্ষার উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এ ক্ষেত্রে যে পুস্তক থেকে প্রত্যক্ষভাবে উপাত্ত সংগৃহিত হয়েছে তা হল:

- আকবর.শ্যামলী, ও অন্যান্য,নারী শিক্ষা উদ্ভব ও বিকাশ, ১৯০০, ষ্টুডেন্ট ওয়েজ প্রকাশনী,বাংলা বাজার, ঢাকা।

গবেষণাটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে হওয়ার কারণে গবেষক যেসকল পুস্তকের ও ওয়েবসাইট এর সহায়তা নিয়েছেন তা হল:

১. হোসেন.সেলিনা, নারী প্রগতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও রোকেয়া হল,২০১১,শ্রাবণ প্রকাশনী,ঢাকা।

২. https://bn.wikipedia.org/wiki/

নারী দিবস, নারী শিক্ষা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত বিষয়গুলো জানার জন্য গবেষক এ সংশ্লিষ্ট পত্রিকা, জার্নাল অনুসরণ করেছেন। যা গবেষণার সাহিত্য পর্যালোচনায় ধারাবাহিকভাবে আলোচিত হয়েছে।

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশ। **১৯৭১** সালে স্বাধীনতা পরবর্তীকালে দেশটিতে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষামূলক সকল ক্ষেত্রে পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতাই গবেষক বাংলাদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রূপান্তর এর ধারা- মেঘনা গুহ ঠাকুরতা, বাংলাদেশ রিইব, থেকে গবেষণা পর্যালোচনা করেছে।

সামাজিক সাংস্কৃতিক রূপান্তর সে দেশের মানুষের জীবনযাত্রা, আদর্শ, মূল্যবোধ এর উপর অনেকাংশে প্রভাব বিস্তার করে। এই রূপান্তরিত মানসিকতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের পিতামাতার মানসিকতা কতটা পরিবর্তন হয়েছে, পিতামাতার মানসিকতা দ্বারা ছাত্রীরা কতটা প্রভাবিত এবং শিক্ষাজীবনের উপর এর প্রভাব কতটুকু তা জানার নিমিত্তে গবেষণার এ পর্যায়ে গবেষক সংশ্লিষ্ট উপাত্তকে বিভিন্ন অধ্যায় এ শ্রেণী বিভক্ত করে উপস্থাপন করেছে।

৩.২. সংশ্লিষ্ট গবেষণাকর্ম পর্যালোচনা

বর্তমান গবেষণাকর্ম সম্পাদনের নিমিত্তে গবেষক গবেষণা সংশ্লিষ্ট যে কটি গবেষণাপত্র পর্যালোচনা করেছে সেগুলোর সারসংক্ষেপ নিচে আলোচনা করা হল:

৩.২.২. ***আরজু, মোহসিনা*** (জুলাই-২০০৯) আই.ই.আর. এম.এড. ডিগ্রির আংশিক চাহিদা পূরণার্থে" পিতামাতার আর্থ সামাজিক অবস্থাভেদে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের ফলাফলের তারতম্য নিরূপণ" শীর্ষক গবেষণা সম্পন্ন করেন। নিচে তার গবেষণার উদ্দেশ্য দেয়া হল।

গবেষণার উদ্দেশ্য

ক. শিক্ষার্থীদের মা বাবার শিক্ষাগত যোগ্যতার সাথে শিক্ষার্থীদের ফলাফলের সম্পর্ক আছে কিনা তা যাচাই করা

খ. গৃহের পরিবেশ, অবসর বিনোদন ও পরিবারের নিয়মনীতি শিক্ষার্থীদের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার ফলাফলের ওপর কোনরূপ প্রভাব ফেলে কিনা তা নিরূপণ করা।

গ. পারিবারিক, সাংস্কৃতিক পরিবেশ শিক্ষার্থীদের ফলাফলের ওপর কোনরূপ প্রভাব ফেলে কিনা তা যাচাই করা।

সিদ্ধান্ত

ক. উচ্চপদস্থ ও মধ্যম শ্রেণির কর্মকর্তার ছেলেমেয়েরা ভাল ও মধ্যম উভয় ধরনের ফলাফল অর্জন করেছে। নিম্ন আয়ের অর্ন্তভুক্ত কর্মচারির সন্তানরা জি.পি.এ কম পেয়েছে। সুতরাং পিতামাতার পেশার সাথে শিক্ষার্থীদের ফলাফলের সর্ম্পক রয়েছে।

খ. উচ্চশিক্ষিত মাতার ছেলেমেয়েরা জিপিএ বেশি পেয়েছে। মধ্যম শিক্ষিত মাতার ছেলেমেয়েরা ভাল ও খারাপ উভয় ধরনের ফলাফল করেছে। স্বল্পশিক্ষিত মাতার ছেলেমেয়ে জি.পি.এ কম পেয়েছে। সুতরাং মাতার শিক্ষাগত যোগ্যতার সাথে শিক্ষার্থীদের ফলাফলের সর্ম্পক রয়েছে।

গ. পিতামাতার আর্থ-সামাজিক অবস্থার সাথে ফলাফলের সর্ম্পক রয়েছে। আর্থ-সামাজিক অবস্থা যাদের ভাল তারা জি.পি.এ বেশি পেয়েছে। যাদের ভাল না তারা কম পেয়েছে।

৩.২.৩. ***মজুমদার,শিবাণী*** (আই.ই.আর.)(এম.এড) ডিগ্রির আংশিক চাহিদা পূরণার্থে "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা নির্ণয়" শীর্ষক গবেষণা সম্পন্ন করেন। নিচে তার গবেষণার উদ্দেশ্য উপস্থাপন করা হল:

গবেষণার উদ্দেশ্য

ক. ছাত্রনেতাদের অভিভাবকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা জানা

খ. ছাত্রনেতাদের অভিভাবকদের পেশা শনাক্তকরণ

গ. ছাত্রনেতাদের অভিভাবকদের পেশা ও আয়ের উৎস জানা

ফলাফল

ক. ছাত্র নেতাদের অভিভাবকদের মধ্যে কেউই আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বর্জিত নয়।

খ. ছাত্র নেতাদের অভিভাবকদের আয়ের উৎসের মধ্যে কৃষিকাজ প্রধান।

গ. নিম্নবিত্ত শ্রেণির কোন ছেলেমেয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রদের নেতৃত্বে নাই।

৩.২.৪. ***বেগম,আফছির,*** আই.ই.আর. (এম.এড.) ডিগ্রির আংশিক চাহিদা পূরণার্থে" ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদে অধ্যয়নরত ছাত্রীদের সামাজিক পটভূমিকা ও উচ্চশিক্ষালাভে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি যাচাই" (১৯৮২) শীর্ষক গবেষণা সম্পন্ন করেন। নিচে তার গবেষণার উদ্দেশ্য দেয়া হল:

গবেষণার উদ্দেশ্য

ক. বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষায় অধ্যয়নরত ছাত্রীদের সামাজিক পটভূমিকা নির্ধারণ

খ. উচ্চশিক্ষা লাভের পর ছাত্রীদের চাকুরী নির্বাচন ও বসবাসের জন্য স্থান নির্বাচনে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি যাচাই

গ. উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্রীদের হার মাত্রা নির্ণয়

ফলাফল

ক. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদে অধ্যয়নরত অধিকাংশ ছাত্রীদের সামাজিক জীবনের পটভূমি নগরভিত্তিক জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট । তাছাড়া যে সকল মেয়েরা হলে আবাসিক ,তাদের অধিকাংশের সামাজিক পটভূমি ছোট শহর বা গ্রামের মধ্যবিত্ত ও শিক্ষিত পরিবারের পারিবারিক পরিবেশের সাথে সংশ্লিষ্ট।

খ. বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষাগ্রহণে মেয়েদের হার ও মাত্রা দিনে দিনে বৃদ্ধি পেলেও সামগ্রিক জনসংখ্যা অনুপাতে এর মাত্রা ও সংখ্যা নিতান্তই কম।

গ. শিক্ষা পরবর্তীকালে জীবন যাপন, বসবাস ও চাকুরীকালীন অবস্থানের জন্য মেয়েরা নগর ও শহর এলাকাকেই অগ্রাধিকার দিয়েছে।

৩.২.৫. সোলায়মান,সামছিয়া, আই.ই.আর.(এম.এড.) ডিগ্রির আংশিক চাহিদা পূরণার্থে “আর্থ সামাজিক অবস্থাভেদে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের তারতম্য” (১৯৮৪) শীর্ষক গবেষণা সম্পন্ন করেন। নিচে তার গবেষণার উদ্দেশ্য দেয়া হল:

উদ্দেশ্য

ক. শিক্ষার্থীদের আর্থসামাজিক অবস্থার সঙ্গে তাদের অর্জিত জ্ঞানের কোনরূপ সম্পর্ক আছে কিনা তা যাচাই করা।

খ. যদি শিক্ষার্থীদের আর্থসামাজিক অবস্থার সঙ্গে তাদের অর্জিত জ্ঞানের সম্পর্ক থেকে থাকে তবে তার প্রকৃতি ও সীমা নির্দিষ্ট করা।

ফলাফল

ক. শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের শিক্ষাগত যোগ্যতার সাথে শিক্ষার্থীদের অর্জিত জ্ঞানের সম্পর্ক আছে। নিম্ন ও মধ্য শিক্ষিত অভিভাবকদের সন্তানগণ পরীক্ষায় ভাল করে।

খ. শিক্ষার্থীদের সামাজিক শ্রেণির সঙ্গে তাদের অর্জিত জ্ঞানের সম্পর্ক রয়েছে।

এছাড়া গবেষক ***এম.ফিল. ও পি.এইচ.ডি.*** পর্যায়ে যেসকল গবেষণার সংশ্লিষ্টতা পেয়েছেন। তা হল:

৩.২.৭. রহমান,ছিদ্দিকুর, এম.ফিল. ডিগ্রির চাহিদা পূরণার্থে "পরিবারে কিশোর অপরাধের আর্থ সামাজিক প্রভাব" (২০১০) গবেষণাটি সম্পন্ন করেন।

৩.২.৮. রহমান. বিলকিস. পি.এইচ.ডি ডিগ্রির চাহিদা পূরণার্থে " উনিশ শতকে বাংলার মধ্যবিত্ত পরিবারে নারী পুরুষ সম্পর্ক" (২০১১) ইতিহাস বিভাগে গবেষণাটি সম্পন্ন করেন।

৩.২.৯. হক. এমদাদুল.এ.কে.এম. পি.এইচ.ডি. ডিগ্রির চাহিদা পূরণার্থে" বাংলাদেশে নারী নেতৃত্বের আর্থ সামাজিক পটভূমি" (২০০৯) রাস্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে গবেষণাটি সম্পন্ন করেন।

পরিশেষে গবেষণাকর্মগুলোর উদ্দেশ্য ও ফলাফল পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, সামছিয়া সোলায়মানের 'আর্থ সামাজিক অবস্থাভেদে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের তারতম্যে' শীর্ষক গবেষণাটি থেকে প্রাপ্ত ফলাফল গবেষককে গবেষণা তথ্য বিশ্লেষণে সহায়তা করেছে। তবে এ বিষয়ে প্রায় নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে,'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রীদের সামাজিক প্রেক্ষাপট অনুসন্ধান' শীর্ষক বিষয়টি নিয়ে ইতো:পূর্বে কোন গবেষণা হয়নি।

চতুর্থ অধ্যায়

নারী শিক্ষা উদ্ভব ও বিকাশ

৪.১.নারী শিক্ষার উদ্ভব ও বিকাশ

৪.২. নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিশ্ব ইতিহাস

চতুর্থ অধ্যায়

৪.১.নারী শিক্ষা উদ্ভব ও বিকাশ

নারীদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় আবির্ভাব এর সূত্রপাত খুব বেশি দিনের নয়। যদিও মানুষের জন্মের পর থেকে শিক্ষার শুরু হয়, অর্থাৎ প্রবাহমান সময়, পরিবেশ, সমাজ, সংস্কার সব কিছুর সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে নারী যে জ্ঞান অর্জন করে সেটাই শিক্ষা। নারীর পুঁথিগত বিদ্যা অর্জন একদিন, দুইদিন বা একবছর, দু'বছরে নয়- যুগ যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অত্যন্ত ধীরে ধীরে নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। এজন্য ভারত উপমহাদেশের সভ্যতা বিকাশের সাথে সাথে সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে সমাজে নারীর অবস্থান, তাঁর ভূমিকা, মর্যাদা, গুণাবলি ইত্যাদি বিষয় জানা প্রয়োজন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সর্ম্পকে আলোচনার প্রারম্ভে বির্বতনের ধারায় নারী যেভাবে বর্তমান পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে- সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন

প্রাচীন যুগ

সৃষ্টির প্রথম থেকে মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশে স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক যেমন বহুমুখী তেমন বৈচিত্র্যময়ও। এই সম্পর্ক কখনও সহযোদ্ধার, কখনও সহকর্মীর, কখনও সাহেব-বাদীর, কখনও শোষক-শোষিতের, কখনও মালিক-শ্রমিকের। তবে সভ্যতার শুরুতে মানুষে মানুষে বা নারী-পুরুষের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য ছিল না। সমাজ পরিবর্তন ও বিবর্তনের সাথে সাথে নারী-পুরুষ,তথা মানুষে-মানুষে বিভেদ সৃষ্টি হতে থাকে। ক্রমশ ব্যক্তিক রাজনৈতিক, সামাজিক, আর্থিক প্রেক্ষাপটে এই পার্থক্য বাড়তে থাকে। এই পার্থক্যের কারণ নিরূপণ এবং তা সমাধানের উপায় নির্ধারণের ক্ষমতা অর্জনের প্রধান মাধ্যম শিক্ষা। মানুষের মৌলিক অধিকারগুলোর মধ্যে অন্যতম অধিকার শিক্ষা মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে বিকশিত করে, নিজের অস্তিত্বকে উপলদ্ধি করতে শেখায়। এটি মানব উন্নয়নে অত্যাবশ্যকীয় উপাদানও বটে। অথচ নারী এবং পুরুষ মিলেই মানব সমাজ। কিন্তু

যুগ যুগ ধরে এই শিক্ষা সমাজের অধিকাংশ ক্ষেত্রে তথা নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে আরও বেশি উপেক্ষিত হয়েছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়ে শিক্ষার অভাব নারীকে করেছে পরাধীন,শৃঙ্খলিত এবং বৈষম্য পীড়িত। এই বঞ্চনা ও নিপীড়ন তাদের মানুষ হিসেবে করেছে অধিকারবোধহীন, সচেনতাবোধহীন,প্রতিবাদহীন। বলতে গেলে নির্জীব প্রায়। বাঁচার এ লড়াই এ প্রাচীন যুগ থেকে সভ্যতার বিবর্তনের ধারায় ধীরে ধীরে মানুষ শিক্ষার গুরূত্বকে উপলব্ধি করতে পেরেছে। নানা ঘাত প্রতিঘাত,চড়াই-উৎড়াই এর মধ্যে দিয়ে সে তার অধিকার অর্জনের সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে। নারী শিক্ষার ক্ষেত্রেও এর ব্যতায় বা ব্যতিক্রম ঘটেনি। প্রাচীন যুগ থেকে এভাবেই রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সাথে সাথে সভ্যতা, সমাজ, সংস্কৃতি, শিক্ষা, অর্থনীতি ইত্যাদির উত্থান-পতন, বিকাশ, নারীশিক্ষার উদ্ভব তথা নারীর অগ্রগতির উপর প্রভাব ফেলেছে।

এক সময় মনে করা হতো ভারতবর্ষের আর্যদের আগমনের সময় থেকেই এদেশে ইতিহাস সংস্কৃতির সূত্রপাত হয়েছে। কিন্তু সিন্ধু সভ্যতা আবিষ্কারে ভারতীয় ইতিহাস সংস্কৃতির দিগন্তকে নতুনভাবে উদ্ভাসিত করেছে। ভারতবর্ষে সিন্ধু সভ্যতার যে নির্দশন পাওয়া গিয়েছে সেটি হল তাম্রপ্রস্তর যুগের। কিন্তু ভারতীয় সভ্যতার শুরু তারও বহুপূর্বে, বহু বৎসর ধরে। কেননা তাম্র প্রস্তর যুগের পূর্বে প্রাচীন. মধ্য ও নব্য প্রস্তর যুগের বহু নিদর্শন ভারত-ভূমিতে পাওয়া গিয়েছে। এসব নির্দশন ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্বের দিগন্ত প্রসারিত করলেও এই প্রস্তর যুগ এবং সিন্ধু সভ্যতার তাম্রপ্রস্তর যুগকে প্রগৈতিহাসিক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। সিন্ধু সভ্যতায় উন্নত ও পরিকল্পিত নগর সভ্যতার নির্দশন পাওয়া গেলেও লিখিত তথ্যের অভাবে প্রায় সবকিছুই অনুমান-নির্ভর। এজন্য ভারতবর্ষে আর্যদের আগমন এবং তাদের বসতি স্থাপন ভারতীয় সভ্যতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

<u>প্রাক-বৈদিক যুগ</u>

প্রাক- বৈদিক যুগ বলতে সাধারণত সিন্ধু-সভ্যতাকেই বোঝায়। ঐতিহাসিক সূত্রমতে এই সভ্যতার জ্ঞান, বিকাশ, প্রসিদ্ধি ইত্যাদি নিরূপণ অনেকটা অনুমান নির্ভর এবং আজও গবেষণা নির্ভর। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হিসেবে এই সভ্যতায় যা কিছু পাওয়া গেছে তার ভিত্তিতে মেয়েদের অবস্থান

সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলা যায় না। তবে নগর কেন্দ্রিক এ সভ্যতায় অনেক ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মিল পাওয়া যায়। যেমন, পোশাক, অলংকার ইত্যাদিতে নারী-পুরুষের একই রকম নিদর্শন মেলে। তাছাড়া প্রসাধন সামগ্রীর নিদর্শন সে যুগে মেয়েদের ফ্যাশন সচেনতার পরিচয় তুলে ধরে। যে ধরনের পোড়ামাটির নিদর্শন বা মূর্তি সে সময়ে পাওয়া গেছে, তার অধিকাংশই নারী মূর্তি। এগুলো একদিকে যেমন সে সভ্যতায় মাতৃমূর্তি পূজা প্রচলনের ইঙ্গিত বহন করে, অপরদিকে মেয়েদের সম্মানের প্রতীকও ধরা যায়। নৃত্যরতা নারীমূর্তি নারীদের কলাবিদ্যার পরিচয় দেয়।

মূলত প্রাগৈতিহাসিক যুগে শিক্ষা বা নারীশিক্ষা সম্পর্কে তেমন কিছু জানা না গেলেও কৃষি কাজে মেয়েরা অংশ নিত। জমি চাষের সময় তারা পুরুষের পাশপাশি কাজ করত। এছাড়া কুম্ভকারের চাকার প্রচলন হবার পর এ চাকা মেয়েরাই ঘোরাত। তবে প্রয়োজনে ছেলেরাও এতে হাত লাগাত।

ঋক-বৈদিক যুগ

বৈদিক যুগের শুরুতে সমাজ ছিল বর্ণ। এ সময়ে পরিবার ছিল পিতৃতান্ত্রিক। এ কারণে স্বাভাবিকভাবেই জনগণ পুত্র সন্তানের আকাঙ্ক্ষা করত। তবে সমাজে নারীর স্থান ছিল পাত্র-পাত্রীর পছন্দকে বিয়ের ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেয়া হত। পতি নির্বাচনে মেয়েরা স্বাধীন ছিল।

ঋক-বৈদিক যুগে সাধারণ মেয়েরা পুরুষের পাশাপাশি সকল কাজে অংশ নিতে পারত। ধর্মাচারণের ক্ষেত্রেও নারী-পুরুষের কোন ভেদাভেদ ছিল না। তবে আইনের দৃষ্টিতে নারীর অধিকার সীমাবদ্ধ থাকায়, তাকে পুরুষ আত্মীয়ের সাহায্যের জন্য নির্ভর করতে হত। সে সময়ে নারীদের গৃহের ভিতর পুরুষের তুলনায় হীন মনে করা হত না। ফলে গৃহ প্রধান শুধু পুরুষেরা নয় মেয়েরাও হতে পারত। এ যুগে বয়ন শিল্পে মেয়েরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। পুরুষ ও নারীর পোশাক পরিধানে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য ছিল না। ঋক-বৈদিক যুগে নারীকে যথেষ্ট সম্মান দেয়া হত। এ সময় ছাত্রীরা এমন জ্ঞানের অধিকারী হত যে, তারা বড় বড় পণ্ডিতের সঙ্গে দর্শন নিয়ে তর্ক বা আলোচনা করার অধিকারী হতো। গৃহস্থালী থেকে শুরু করে ধর্মাচরণ পর্যন্ত নারীর অধিকার ছিল অবাধ।

বৈদিক যুগ

বেদের ব্রাহ্মণ এবং সংহিতায় দেখা যায়, এ সময় কন্যাসন্তানের জন্মকে দুর্ভাগ্য বলে মনে করা হতো। নারী, পুরুষের সঙ্গে ধর্মাচরণের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। পারিবারিক জীবনেও মেয়েদের মর্যাদা কমে গিয়েছিল। এ যুগে বাল্য বিবাহ ও পণপ্রথা বেড়ে যায়। নারীদের জন্য বিয়ের নিয়মকানুন অপেক্ষাকৃত কঠোর হয়। নারীরা উচ্চ নীতিনিষ্ঠ জীবনযাপন করবে এটাই সমাজের প্রত্যাশা ছিল। কিন্তু সমাজের এই প্রত্যাশা থাকলেও নারীকে সে মর্যাদা দেয়া হত না। সেখানে তাদের মর্যাদা এত কমে গিয়েছিল যে, পুরুষরা তাদের সুরা বা জুয়াখেলার সমপর্যায়ের বস্তুতে পরিণত করেছিল। সম্পত্তির অধিকার থেকেও নারীদের বঞ্চিত করা হয়। বৈদিক যুগে নারীদের মর্যাদা সংকুচিত হলেও সে যুগে জ্ঞান বিজ্ঞানের উৎকর্ষতা লক্ষ্যণীয়। জ্ঞানে ও শিক্ষায় সমৃদ্ধ এ যুগে শত বাধা পেরিয়ে নারীর অবস্থান ও চিন্তায় কিছু কিছু নারী চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল। তৎকালীন কর্মজীবনে মেয়েদের ভুমিকা বা অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য ছিল।

বৈদিকোত্তর যুগ

এই সময়ের ঐতিহাসিক সূত্র রামায়ণ, মহাভারত এবং সূত্র সাহিত্য। এ সময়কে মহাকাব্যের যুগও বলা হয়। এ যুগে নারীর মর্যাদা আরও কমে গিয়েছিল। সতীদাহ প্রথার প্রচলন বেড়ে যায়। দ্রৌপদির বহুপতি গ্রহণ তৎকালীন সামাজিক গ্লানির তথা নারীর মর্যাদাহানীর জ্বলন্ত প্রমাণ। এ যুগে নারীরা অলস সন্তানকে কর্মদক্ষ করার জন্য, তুষের আগুনের মত ধিকি ধিকি করে না জ্বলে অল্পক্ষণের জন্য হলেও অগ্নিশিখার মত জ্বলে উঠতে প্রেরণা যুগিয়েছেন, উদীপ্ত হতে সাহায্য করেছেন। এতে তৎকালীন সমাজে নারীর সন্তানের প্রতি কর্তব্যবোধ সচেতনতা, অসামান্য দৃপ্ত প্রতিভা এবং দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। স্বয়ম্বরা প্রথাও নারীর মর্যাদার পরিচয় বহন করে।

এছাড়া সমাজে পর্দা প্রথার প্রচলন থাকলেও নারীরা জাতীয় উৎসব বা শোকের সময় অন্তঃপুর ছেড়ে বাইরে বের হত।

<u>বৌদ্ধ যুগ</u>

মূলত নারীদের সম্পর্কে গৌতম বুদ্ধের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল উদার। তিনি মেয়েদের গৃহকোণ ছেড়ে সমাজের সব ধরনের কাজে অংশগ্রহণের অধিকার স্বীকার করে নেন। তিনি 'বৃজি প্রজাতন্ত্রে' সমাজ পরিচালনার জন্য সাতটি নিয়ম বেধে দেন। তার পঞ্চম নিয়ম ছিল যে "স্ত্রীলোকের সম্মান রাখতে হবে। বিবাহিতা বা অবিবাহিতা কোন স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার করা যাবে না।" তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত বৃজির লোকেরা এই নিয়ম গ্রহণ করে[২১]

প্রথম দিকে নারীকে নির্বাণ লাভের প্রতিবন্ধক বলে মনে করা হত। সঙ্ঘে স্ত্রীলোকের প্রবেশাধিকার নিয়ে আতঙ্ক ছিল। দীনেশ চন্দ্রসেনের বর্ণনা অনুযায়ী স্বয়ং বুদ্ধও সঙ্ঘের বিশুদ্ধতা রক্ষায় স্ত্রীলোকের প্রবেশাধিকারকে সহজভাবে মেনে নিতে পারেননি।

<u>মৌর্য যুগ</u>

খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর শেষ দিকে ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম যে বংশ ভারতব্যাপী বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে, সে বংশ হল মৌর্য বংশ; যা মৌর্যযুগ নামেও পরিচিত। মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য। মেগাস্থিনিস চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের 'নারী রক্ষিবাহিনীর' কথা বলেছেন। এরা শিকারেও অংশ নিত। তাঁর বিবরণ থেকে জানা যায় আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণ প্রতিরোধের কাজে পাঞ্জাবের রমণীরা তাঁদের স্বামীদের সাহায্য করেছিলেন। রাজ্য শাসনেও মেয়েদের ভূমিকার উল্লেখ পাওয়া যায়। যদিও শাস্ত্রকারদের দৃষ্টিভঙ্গীতে নারী সম্মানের যোগ্যা হলেও স্বাধীনতার যোগ্যা নন। তবে ইতিহাসের তথ্যানুযায়ী রাজ মহিষীরা প্রয়োজনে তাঁদের নাবালক পুত্রের অভিভাবিকা রূপে রাজকার্য

২১.*প্রভাতাংশু মাইতি, ভারত ইতিহাস পরিক্রমা (প্রাচীন যুগ-১২০৬ খ্রিঃ, পৃঃ৯৮), ১৯৯১,শ্রীধর প্রকাশনী, কলকাতা।*

পরিচালনা করতেন। সংস্কৃত সাহিত্যে সেই সময় এমন অনেক মহিলার সন্ধান মেলে যাঁরা শিক্ষিত ও সঙ্গীত রচয়িতা ছিলেন। এঁদের অনেকেই লিখতে, পড়তে, এমনকি চিত্রশিল্পী সৃষ্টি ও মালা তৈরীর কাজে বিশেষভাবে দক্ষ ছিলেন। রোমিলা থাপারের মতে " এ সত্ত্বেও সমাজে নৈতিক শিথিলতা প্রবল ছিল।{মাইতি,পৃ.১৯৯}"।

মৌর্যোত্তর অন্যান্য বংশ

ড. চট্টোপাধ্যায়ের মতে " মৌর্য পরবর্তী এবং গুপ্ত পরবর্তী যুগের ইতিহাস প্রধানত সাতবাহন এবং কুষাণগণের দ্বারা চিহ্নিত। সাতবাহনগণ দক্ষিণভারতে এবং কুষাণগণ উত্তর ভারতে, মৌর্য পরবর্তী বিক্ষুদ্ধ যুগের অবসান ঘটিয়েছেন। এই অন্ধকার মধ্যবর্তী সময়ে উজ্জ্বল সাফল্যের নিদর্শন তারাই রেখেছিল।[২২]

সাতবাহন রাজারা মাতৃপরিচয় দ্বারা চিহ্নিত ছিলেন ; কিন্তু বংশানুক্রমিক এবং পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা ছিল। এদের রাজত্বকালে ভাষা এবং সাহিত্য বিশেষভাবে বিকশিত হলেও গৌতমী ছাড়া তেমন কোন নারী চরিত্র ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য স্থান পায়নি।

গুপ্ত যুগ

খ্রিস্টিয় শতাব্দীর শুরুতে ভারতীয় সমাজে নারীর অবস্থানের পরিবর্তন লক্ষণীয়। গুপ্ত শাসনকার্যে মেয়েদের অংশগ্রহণের নিদর্শন রয়েছে। এ প্রসঙ্গে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কন্যা প্রভাবতীর কথা বলা যায়। এছাড়া কাশ্মীর, উড়িষ্যা এবং অন্ধ্র প্রদেশে রাণীরা রাজ্য শাসন করেছিলেন। কানাড়া অঞ্চলে মেয়েরা বিভিন্ন প্রদেশ ও গ্রাম শাসন করতেন। প্রত্যেক যুগের মত এযুগেও উচ্চ শ্রেণীর মেয়েরা সুশিক্ষিত ছিলেন। মেয়েদের মেধাকে শাণিত করার ক্ষেত্রে বাৎসায়ন শাস্ত্রজ্ঞানকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর দৃষ্টিতে আদর্শ পত্নী হবেন সুশিক্ষিতা; যিনি সারা বৎসরের আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখতে

২২.চট্টোপাধ্যায় সুনীল, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস(১ম খন্ড, পৃ.২৪৪), ১৯৯৭,পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ,কলকাতা।

পারবেন। তবে সমকালীন সাতিহ্য থেকে জানা যায় এ সময়ে আশ্রমবাসিনীরাও প্রাচীন ইতিহাস পড়ত, কাব্য বুঝত এবং রচনা করত। এ যুগে কোথায়ও কোথায়ও ছেলেমেয়ের একত্রে লেখাপড়ার কথা জানা যায়। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, এক সময় যখন মেয়েরা পবিত্র বেদ রচনা করতে পারতেন, সেই মেয়েদেরই পরবর্তী যুগে বেদ পাঠ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।

<u>পাল যুগ</u>

পাল রাজাদের সময় দেশে জ্ঞান ও ধর্মকাজ যখন খ্যাতির শীর্ষে, তখনও বাঙালি নারীর জন্য উচ্চ শিক্ষার দ্বার প্রসারিত ছিল না। পূর্ব পুরুষদের ন্যায় তৎকালীন শাসকগণও নারীশিক্ষার আনুষ্ঠানিক কোন আয়োজন রাখেন নি বা প্রয়োজনবোধ করেন নি।

<u>সেন যুগ</u>

সেন যুগ প্রাচীন ও মধ্যযুগের মাঝামাঝি সময় হলেও এ যুগের ঐতিহাসিক তথ্যের অভাব রয়েছে। এ সমাজব্যবস্থা ও ধর্মের প্রভাব দ্বারা প্রবলভাবে আচ্ছাদিত ছিল। এ যুগে যেমন কবি সাহিত্যিকদের লেখার স্বাধীনতা ছিল, তেমনি মেয়েরাও যে অনেক ক্ষেত্রে তাদের ইচ্ছা, অভিব্যক্তিকে প্রকাশ করার স্বাধীনতা ভোগ করত তার পরিচয় মেলে। সম্ভবত এই স্বাধীনতার জন্য সেন যুগ সাহিত্যে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। যেখানে নারী উচ্চবর্ণের হলে নারী হয়েছে পুরুষের ভোগের সামগ্রী, সমাজ প্রতিপন্ন করেছে ঘৃণিত ও অস্পৃশ্য হিসেবে, লুণ্ঠিত হয়েছে স্বীয় মর্যাদা ও অস্তিত্ব। এভাবেই সে সময় সাধারণ নারীর অনেক বিকশিত, প্রস্ফুটিত সম্ভাবনা অকালে ঝরে গেছে,দলিত হয়েছে তৎকালীন সমাজের শাসক-শাসন, রীতি-নীতির যাঁতাকলে পড়ে। সে কারণেই সেন আমল সাহিত্যে-সংস্কৃতিতে উৎকর্ষতার তুঙ্গে উঠলেও, সাধারণ নারীরা শিক্ষার আলো দ্বারা তেমনভাবে আলোকিত হবার সুযোগ পায় নি।

মুসলিম যুগ

খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতকের প্রথম দিকে সিন্ধুরাজ দাহিরের পরাজয় ও মোহাম্মদ বিন কাশিমের সিন্ধু বিজয়ের এর মাধ্যমে ভারত ভূমিতে প্রথম মুসলিম পদক্ষেপ সূচিত হয়। মধ্যযুগের সাধারণ সামাজিক ও ধর্মীয় রীতি অনুসারে মুসলমান মেয়েদের কঠোর পর্দাপ্রথা মেনে চলতে হত।' কানুন-ই-ইসলাম' নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায় মুসলমান মেয়েরা সাত বছর বয়স পর্যন্ত মক্তবে পড়াশুনা করতে পারত। তারপর তারা পর্দার আড়ালে আবদ্ধ হতে বাধ্য হতে। সমাজে পর্দা প্রথার ফলে সাধারণ মেয়েদের মধ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। মাধ্যমিক ও উচ্চপর্যায়ে মেয়েদের শিক্ষাগ্রহণ প্রকৃতপক্ষে উচ্চ শ্রেণী ও উচ্চ মধ্যবিত্ত এবং অভিজাত শ্রেণীর_মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এই শিক্ষার কোন নিয়ম পদ্ধতি ছিল না; তবে তৎকালীন শাসকগণ কর্তৃক তাদের মেয়েদের শিক্ষার জন্য ক্রমান্বয়ে মক্তব, মাদ্রাসা ইত্যাদি স্থাপন নারীশিক্ষার প্রসারে তথা নারীকে পর্দার অন্তরাল থেকে বেরিয়ে আসতে সহায়তা করেছিল।

সুলতানী যুগ

সুলতানী আমলে ফিরোজ তুঘলক[১৩৫১-১৩৮৮ খ্রি.] নিজে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং শিক্ষা প্রসারের চেষ্টা করেন। তিনি পণ্ডিত ও সাহিত্যিকদের মধ্যে বৃত্তি ও অর্থ সাহায্য করতেন। তিনি দিল্লিতে বিদ্যাকেন্দ্র স্থাপন করেছেন। ঐতিহাসিক 'ফেরিস্তার' মতে, তিনি কমপক্ষে ৩০ টি মসজিদ সংলগ্ন মহাবিদ্যালয় স্থাপন করেছেন। রহিম ফেরিস্তার উদ্ধতি দিয়ে বলেন যে, সম্রাট সুলতান একটি শহর নির্মাণ করেছিলেন। এখানে কেবল রমণীরাই বসবাস করতেন। এসব রমণীদের সব রকমের

কলাবিদ্যা ও বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়া হত। এদের মধ্যে শিক্ষয়িত্রী, সঙ্গীতজ্ঞ, কুরআন তেলাওয়াতকারিনী মহিলা ছিলেন। এসব মহিলারা শিক্ষাদান ও অন্যান্য বৃত্তি অবলম্বন করতেন।[২৩]

পরবর্তী সময়ে দিল্লিতে সৈয়দ বংশ ও লোদী বংশের রাজত্বকালে মাদ্রাসা স্থাপন, ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্টপোষকতা, শিল্প স্থাপত্য ও সংস্কৃতির দিক থেকে উন্নতির প্রসার ঘটলেও নারী শিক্ষার প্রসারে উল্লেখযোগ্য তথ্যগত তেমন কিছু পাওয়া যায়নি।

<u>নবাবী যুগ</u>

১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট হূমায়ন সর্বপ্রথম বাংলা জয় করেন। কিন্তু এই বিজয় মাত্র কয়েকমাস স্থায়ী হলেও তিনি তৎকালীন বাংলার রাজধানী গৌড়ের সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ হয়ে এর নাম রাখেন জান্নাতাবাদ[রহিম, ২য় খণ্ড, পৃ.৮১]। সম্রাট আকবরের সময় [১৫৩৮] মোঘল সাম্রাজ্যভুক্ত বিভিন্ন প্রদেশের আইন শৃঙ্খলা রক্ষার্থে সুবাদার শাসন পদ্ধতির প্রচলন হয়। এসব প্রদেশ বা সবার রাজস্ব বিভাগ পরিচালনার জন্য একজন প্রাদেশিক দিওয়ান নিযুক্ত করা হতো। মুর্শিদকুলি খানের সময় থেকেই বাংলাদেশ কার্যত স্বাধীনভাবে নবাবদের দ্বারাা শাসিত হতো।

সুবাদারী ও নবাবী আমলের অভিজাত মহল তাদের কন্যাদের শিক্ষার জন্য পূর্ববর্তী মুসলমানদের শিক্ষার আদর্শ অনুসরণ করেন।

<u>ব্রিটিশ যুগ</u>

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা লাভের পর বাস্তবিকই বহুবছর ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি নজর দেয়নি। শুধু কোম্পানির সুবিধার্থে উচ্চপদস্থ কর্মচারীর বিচার ও শাসন বিভাগীয় সমস্যা লাঘব করার উদ্দেশ্যে কতগুলো প্রাচ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরীর ক্ষেত্রে

২৩.রহিম.এম.এ.[মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান অনূদিত], বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস (দ্বিতীয় খন্ড পৃ.২৫০), ১৯৯৬,বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

প্রত্যক্ষভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকে। এগুলোর মধ্যে ছিল কলকাতার মাদ্রাসা [১৭৮১, খ্রি.] বারাণসীর সংস্কৃত কলেজ [১৭৯১ খ্রি.], কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ [১৮০০ খ্রি.] ইত্যাদি। মেয়েরা কোম্পানির কর্মচারী হতে পারবে না বলে তাদের শিক্ষাদীক্ষার কথা ভাবারও দরকার মনে হয়নি। ১৮১৩ সারের সনদ আইনে ভারতবাসীর শিক্ষার জন্য সরকারি তহবিল থেকে অন্তত এক লক্ষ টাকা খরচ করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হলেও তার এক কপর্দকও নারী শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হয় নি।

এমনকি ১৮৫৪ সালে উডের ডেসপ্যাচে নারীশিক্ষা প্রসারে সরকারি ইচ্ছা প্রকাশ পেলেও প্রধানত বেসরকারি উদ্যোগকে উৎসাহিত করা হয়। এতে সরকারি সাহায্য সহযোগিতার কথা বলা হয়। ফলে ১৮৫৭ সালে বাংলার ছোটলাট স্যার ফ্রেডারিক হ্যালিডে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য মনোযোগী হন। পরে তারই অনুরোধে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিভিন্ন এলাকায় অবৈতনিক বিদ্যালয় খোলেন।

দেশীয় উচ্চ শ্রেণীতে নারী-শিক্ষা সচেনতা সৃষ্টি

ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিভিন্ন সময়ের সামাজিক, ধর্মীয় দিকগুলো বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে অধিকাংশ সমাজের শাসনকর্ম ও শাসনদণ্ড বরাবরই পুরুষের কব্জাগত ছিল। কাজেই আইনগুলো স্বাভাবিকভাবে পুরুষের পক্ষেই তৈরী হয়। রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হিন্দু অসহায় নারীদের ধর্মীয় গণ্ডি থেকে পরিত্রাণ দেয়ার উদ্দেশ্যে অসাধারণ প্রচেষ্টা নিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে রাজা রামমোহন রায়ের এক বৌদীর স্বামীর সাথে সহমরণে যাবার ঘটনা তাঁর মনে বিরুপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। তখন থেকে তিনি বাল্যবিবাহ ও সতীদাহ প্রথার ঘোর বিরোধী ছিলেন।

অ্যাডামের রির্পোটে দেখা ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে প্রতি পাঁচ লক্ষ মানুষের মধ্যে মাত্র ৮ জন নারী অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন ছিল। নারীশিক্ষা প্রসারের ব্যাপারে দেশের পুরুষ সমাজ বিশেষ রক্ষণশীল ছিলেন। তাঁরা মেয়েদের জন্য নিতান্ত প্রাথমিক স্তরের ঘরোয়া লেখাপড়ার আয়োজন করে সন্তুষ্ট ছিলেন।

বেসরকারি ও মিশনারিদের প্রচেষ্টায় নারী শিক্ষা বিস্তার

উনিশ শতকের শুরুতে নারীশিক্ষা বিস্তারে কয়েকজন ইউরোপীয় মহিলা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। **১৮১২** খ্রিস্টাব্দে লন্ডন মিশনারি সোসাইটির পক্ষে রেভারেন্ড মে চুঁচুড়াতে আসেন। **১৮১৮** সালে চুঁচুড়া লন্ডন মিশনারি সোসাইটির পক্ষে 'রেভারেন্ড মে' প্রথম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তখন স্কুলের ছাত্রী জোগাড় করা ছিল খুব কঠিন কাজ। অনেক খোঁজাখুঁজির পর মাত্র ৮ জন ছাত্রী জোগাড় করে স্কুলটি চালু হয়। **১৮১৯** সালে কলকাতার ব্যাপটিস্ট মিশনারীদের প্রচেষ্টায় ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি নামে একটি সংস্থা কলকাতার উল্টোডাঙ্গায় গৌরীবাড়ি অঞ্চলে জুভেনাইল স্কুল নাম দিয়ে প্রথম অবৈতনিক ফ্রি স্কুল চালু করে। মূলত " মেয়েদের স্কুল তৈরী করার কাজ মেয়েদের দ্বারা সম্পন্ন হওয়া বাঞ্ছণীয়"[২৪]- এই ভেবেই ইংরেজ মহিলাদের নিয়ে ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি গড়ে উঠে।

১৮৪৯ সালে জে.এ. বেথুন ব্যক্তিগতভাবে সহকর্মীদের সহায়তায় কলকাতায় ভিক্টোরিয়া গার্লস স্কুল স্থাপন করেন। এখানে ছাত্রীরা বিনা বেতনে পড়তে পারত। স্কুলটি উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু মেয়েদের জন্যই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। উপরন্তু ধর্মান্তরিত করার কোন লক্ষ্য স্কুলটির ছিল না। মাতৃভাষার মাধ্যমে এখানে শিক্ষা দেয়া হত।

২৪.ঘোষ অরুণ, শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস(পৃ. ১৫৪), ১৯৮৮,এডুকেশনাল এন্টারপ্রাইসার্জ, কলিকাতা-৯।

নারী শিক্ষার অগ্রগতি

১৮৫০-১৮৬০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে নারীশিক্ষার সফলতা খুবই সামান্য ও সীমিত ছিল। গোঁড়া হিন্দুরা তখনো চরমভাবে নারীশিক্ষার বিরোধিতা করে। এমন কি যারা কন্যাদের স্কুলে পাঠাতেন তাদের সমাজচ্যুত করা হতো। ফলে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করা কঠিন হয়ে পড়ে। এই সময় এমন অনেক স্কুল প্রতিষ্ঠার পর ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে, প্রতিষ্ঠাতাদের বিরুদ্ধে প্রাণ নাশের হুমকিসহ ক্রিমিনাল কেস পর্যন্ত করা হয়েছে। তাছাড়া সেই সময় হাতে গোনা কয়েকজন নারী শিক্ষক ছিলেন যারা নিজেরাও ততটা শিক্ষিত ছিলেন না।

১৮৬০-৭০ সালের মধ্যে আর্কষণীয় আদর্শ মহিলার ধারণা কার্যত দ্রুত পরিবর্তিত হতে থাকে। সমসাময়িক সাহিত্যে এর পরিষ্কার প্রতিফলন দেখা যায়। দীনবন্ধু মিত্র, জোতিন্দ্রনাথ ঠাকুর,উপেন্দ্রনাথ দাশের প্রায় সকল নায়িকাই শিক্ষিত ছিলেন। এমনকি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যিনি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়ে গোঁড়া ছিলেন, তিনিও তার নায়িকাদের শিক্ষিত হিসেবে চিত্রায়িত করেছিলেন। এসব নাটক,উপন্যাস বিশেষভাবে বঙ্কিমের উপন্যাস শিক্ষিত বাঙালিদের উপর শক্তিশালী প্রভাব ফেলে। ফলে অনেকে প্রায় নিজের অজান্তে নারীশিক্ষার ধারণা মেনে নিতে থাকে।[২৫]

annette akroyd এর নেতৃত্বে হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের উচ্চশিক্ষা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দেয়ার প্রশ্নের বিতর্ক চরম আকার ধারণ করে । annette akroyd তাঁর বাঙালি বন্ধুদের নিয়ে এই বিদ্যালয় শুরু করেছিলেন। এদের মধ্যে ছিলেন মনমোহন ঘোষ, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী এবং দুর্গা মোহন দাস। এটাই প্রথম বালিকা বিদ্যালয় যেখানে কিশোরী মেয়েরা উচ্চশিক্ষা লাভ করতে সক্ষম হয়। প্রতিটি ক্ষেত্রেই বাঙালি মেয়েদের জন্য এটি মাধ্যমিক শিক্ষা শুরু করেছিল। এই স্কুলের ছাত্রী কাদম্বিনী বসুকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম অফিশিয়াল

২৫.আকবর. শ্যামলী ও অন্যান্য,নারী শিক্ষা উদ্ভব ও বিকাশ, ১৯০০,ষ্টুডেন্ট ওয়েজ প্রকাশনী,বাংলা বাজার, ঢাকা।

পাবলিক পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের অনুমতি দেয়া হয়। এছাড়া এটিই প্রথম স্কুল যেখানে মেয়েদের জন্য হোস্টেলের ব্যবস্থা করা হয়।[২৬]

৩.২. নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিশ্ব ইতিহাস

আর্ন্তজাতিক নারী দিবস প্রতি বছর ৮ মার্চ তারিখে পালিত হয়। সারা বিশ্বব্যাপী নারীরা একটি প্রধান উপলক্ষ্য হিসেবে এই দিবস উদযাপন করে থাকেন। বিশ্বের এক এক প্রান্তে নারী দিবস উদযাপনের প্রধান লক্ষ্য এক এক প্রকার হয়। কোথাও নারীর প্রতি সাধারণ সম্মান ও শ্রদ্ধা উদযাপনের মুখ্য বিষয় হয়, আবার কোথাও মহিলাদের আর্থিক, রাজনৈতিক ও সামজিক প্রতিষ্ঠাটি বেশি গুরুত্ব পায়। এই যে একটা বিশেষ দিবস তার পিছনে আছে অধিকার আদায়ের সংগ্রাম, ইতিহাস। আজকের যে মেয়েটি তাঁর শ্রমের সঠিক মজুরী পাচ্ছেন, যে কর্মজীবী নারী ভোগ করছেন প্রসবকালীন ছুটি; সুস্থ-সুন্দর কাজের পরিবেশে যে নারীটি কাজ করছেন, তাদের এই অর্জনের পিছনে আছে যেমন যোগ্যতা ও ক্ষমতা,তেমনি আছে ৮ মার্চের ইতিহাস দিনটির প্রেরণা। **১৮৫৭** খ্রিস্টাব্দে মজুরি বৈষম্য, কর্মঘণ্টা নিদিষ্ট করা, কাজের অমানবিক পরিবেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের রাস্তায় নেমেছিলেন সুতা কারখানার নারী শ্রমিকেরা। সেই মিছিলে চলে সরকার লেঠেল বাহিনীর দমন পীড়ন। **১৯০৮** খ্রিস্টাব্দে নিউইয়র্কের সোশাল ডেমোক্রেট নারী সংগঠনের পক্ষ থেকে আয়োজিত নারী সমাবেশে জার্মান সমাজতান্ত্রিক নেত্রী ক্লারা জেকিনের নেতৃত্বে সর্বপ্রথম আর্ন্তজাতিক নারী সম্মেলন হলো। ক্লারা ছিলেন জার্মান রাজনীতিবিদ;জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির স্থপতিদের একজন। এরপর **১৯১০** খ্রিস্টাব্দে নারী প্রতিনিধি হিসেবে এতে যোগ দিয়েছিলেন। এ সম্মেলনে ক্লারা প্রতিবৎসর ৮ মার্চকে আর্ন্তজাতিক নারী দিবস

২৬.mursid.p.47-48}murshid Gulam[1983],Reluctant debutante, response of bengali women to modernization ১৮৪৯-১৯০৫,১৯৮৩

হিসেবে পালন করার প্রস্তাব দেন। সিদ্ধান্ত হয় ১৯১১ খ্রিস্টাব্দ থেকে নারীদের সম অধিকার দিবস হিসেবে দিনটি পালিত হবে। দিবসটি পালনে এগিয়ে আসে বিভিন্ন দেশের সমাজতন্ত্রীরা। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে বেশ কয়েকটি দেশে ৮ মার্চ পালিত হতে লাগল। বাংলাদেশেও ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতা লাভের পূর্ব থেকেই এই দিবসটি পালিত হতে লাগল। অতঃপর ১৯৭৫ সালে ৮ মার্চকে আর্ন্তজাতিক স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। দিবসটি পালনের জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রকে আহবান জানায় জাতিসংঘ। এরপর থেকেই সারা পৃথিবী জুড়েই পালিত হচ্ছে দিনটি নারীর সমঅধিকার আদায়ের প্রত্যয় পুনর্ব্যক্ত করে।[২৭]

যখন ইউরোপ আমেরিকা জুড়ে শিল্প বিপ্লব ঘটে তখন নতুন নতুন আবিষ্কারে বিশ্বজুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। ওই সময় চোখে পড়ে শিল্প-কারখানায় নারী ও পুরুষের মতভেদ। নারীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সামজিক, পারিবারিক ও অর্থনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। অধিকার আদায়ের নানা উল্লেখযোগ্য ঘটনায় আজকের ৮ মার্চ আর্ন্তজাতিক নারী দিবস।

১৯০৯ সাল

আমেরিকার সোসালিস্ট পার্টি এ বছর ২৮ ফেব্রুয়ারি নারী দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। সারা আমেরিকায় ২৮ ফেব্রুয়ারি নারী দিবস পালিত হয়। ১৯১৩ সাল পর্যন্ত ফেব্রুয়ারির শেষ রোববার পর্যন্ত নারী দিবস হিসেবে পালন করে আমেরিকানরা।

১৯১০ সাল

১৯১০ সালে একটি সমাজতান্ত্রিক সম্মেলন হয় কোপেনহেগ এ। এই সম্মেলনে আর্ন্তজাতিক নারী দিবস পালন করার প্রস্তাবটি প্রথম গৃহিত হয়। প্রস্তাবটি বিপুল জনসমর্থন পায়। ১৭ টি দেশের ১০০ জন নারী সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, যাদের মধ্যে ৩ জন নির্বাচিত ফিনল্যান্ডের নারী উল্লেখযোগ্য। যদিও কোন নিদিষ্ট তারিখ চিহ্নিত করা হয়নি এই সম্মেলনে।

২৭.www.beshto.com/questionid/18925,march-8, 2014-1908

১৯১১ সাল

১৯১১ সালে ১৯ মার্চ নারী দিবস হিসেবে পালিত হয় ডেনমার্ক, সুইজারল্যান্ড, অষ্ট্রিয়া এবং জার্মানিতে। দেশগুলোতে সব মিলিয়ে দশলাখ নারী-পুরুষ মিছিল করে দাবি জানায়, নারী- পুরুষের মধ্যে কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন রকমের মতভেদ দূর করার। তার কিছুদিন পরেই ইতিহাস প্রত্যক্ষ করে এক ভয়াবহ দৃশ্যপট। ট্রাইএঙ্গেল ফায়ার নামে খ্যাত এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় মৃত্যুবরণ করে করে ১৪০ জন নারী শ্রমিক। এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা নারী দিবস তথা আর্ন্তজাতিক শ্রমিক আইনের মোড় নতুন দিকে ঘুরিয়ে দেয়।

১৯১৩-১৯১৪ সাল

এই সময়ের মধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসে নারীদের অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে। তখন প্রথম মহাবিশ্ব যুদ্ধের সূচনা।এই যুদ্ধের বিপক্ষে সর্বজনীন শান্তি কামনায় রাশিয়ার নারীরা ১৯১৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ রোববার আর্ন্তজাতিক নারী দিবস পালন করে। ইউরোপের বিভিন্ন জায়গায় ৮ মার্চ তার আগের ও পরের দিনগুলোতে নানারকম কর্মশালার আয়োজন করে নারীরা। এর উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধের বিরোধিতা করা অথবা যুদ্ধে লিপ্ত দেশগুলোর নারীদের সঙ্গে নিজেদের সমর্থন ও সমবেদনা প্রকাশ করা।

১৯১৭ সাল

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়া বিশ লাখ লোক হারায়। এমনি অবস্থায় নারীরা আবারো ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ রোববার অবরোধ করার ঘোষণা দেন।যেটা stike for breade and peace” নামে খ্যাত। রাজনৈতিক নেতারা এই অবরোধের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। কিন্তু নারীরা অবরোধ কর্মসূচি চালিয়ে যায়। তারপরে মাত্র চারদিন পর জার বাধ্য হন নারীদের ভোটাধিকার

দিতে। রাশিয়ার গর্ভমেন্ট এই অধিকার গ্রাহ্য করে। এই ঐতিহাসিক অবরোধের দিনটি জুলিয়ান ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ছিল ২৩ ফেব্রুয়ারী। জুরিয়ান ক্যালেন্ডার রাশিয়ানরা মেনে চলত। কিন্তু সারা বিশ্বে গ্রেগোরিয়ান ক্যালেন্ডার অনুযায়ী দিবসটি ছিল ৮ মার্চ। সেই থেকে এই দিবসটি আর্ন্তজাতিক নারী দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। ১৯৪৫ সালে জাতিসংগ সনদ স্বাক্ষরিত হয়। সেটাই ছিল প্রথম কোনো আর্ন্তজাতিক চুক্তি যেটা জেন্ডার ইনিকুয়ালিটির বিরুদ্ধে করা হয়। জাতিসংঘ সংস্থা সেই থেকে আজ অবধি নানা কাজ করে আসছে নারীদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, পারিবারিক নানা অধিকার রক্ষা করার জন্য।[২৮]

১৯৭৫ সাল

আর্ন্তজাতিক নারী বছর থেকেই জাতিসংঘ ৮ মার্চ আর্ন্তজাতিক নারী দিবস উৎযাপন করা শুরু করেন।

১৯৭৭ সাল

নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে একটি সুনির্দিষ্ট দিন ঠিক করার প্রস্তাব জাতিসংঘে গৃহিত হয়। ঐতিহাসিক ও জাতীয় ঐতিহ্য অনুযায়ী বছরের কোন একটা দিন পালন করার জন্য সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

১৯৯৫ সাল

বেইজিং একটি ঘোষণা করেন, যেখানে ১৮৯ জন সরকার একটি ঐতিহাসিক রোডম্যাপ এ স্বাক্ষর করেন, ১২ টি সমালোচনামূলক জায়গা নিয়ে। যেন সেই এলাকার মেয়েরা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে পারেন, পছন্দমত ব্যায়াম করতে পারেন, পড়াশুনা করতে পারেন, চাকরী করতে পারেন এবং সমাজে সহিংসতা ও বৈষম্য মুক্ত হতে পারেন।

২৮.http:/www.manobkantha.com /2014/03/08/162856

২০১৪ সাল

নারীদের অবস্থা নিয়ে কমিশনের ৫৮তম অধিবেশনে লিঙ্গ সমতা সর্ম্পকিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। জাতিসংঘের স্বত্তা ও সারা বিশ্ব থেকে স্বীকৃত এনজিও আটটি মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল অগ্রগতি স্টক এবং অবশিষ্ট চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন। এমডিজি নারীর ক্ষমতায়ন ও লিঙ্গ সমতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

ইউনাইডেটনেশন এর সদস্যগণ ১৯৪৫ সাল থেকে পুরুষ এবং নারীর মাঝে সমতা করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। বছরের পর বছর পালাক্রমে এর উন্নতি সাধিত হচ্ছে।[২৯]

২৯.http:/www.bd24live.com/bangla/article/29827

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলাদেশের সামাজিক সাংস্কৃতিক রূপান্তরের ধারায় নারী

৫.১ বাংলাদেশের সামাজিক সাংস্কৃতিক রূপান্তরের ধারায় নারী

ইতিহাস জুড়ে সমাজ ও সংস্কৃতির নানাবিধ ব্যাখ্যা দিয়েছেন সমাজ বিজ্ঞানীরা, যেমন দিয়েছেন তারা সমাজ ও সাংস্কৃতিক রূপান্তরের বর্ণনা। বেশি তাত্ত্বিক আলোচনায় না গিয়ে সহজভাবে বলা যায় সমাজ হচ্ছে এমন কিছু মানুষের সমষ্টি যারা কিনা বিভিন্ন বন্ধন সূত্রে আবদ্ধ যেমন জাতি, ধর্ম বর্ণ, নাগরিকত্ব ইত্যাদি। এই বন্ধন সূত্র আবার ভিন্ন ভিন্ন আদল, যেমন প্রথাগত, গণতান্ত্রিক ক্ষমতার কাঠামো তৈরী করতে পারে।অন্যদিকে সংস্কৃতিকে সহজভাবে বর্ণনা করা যায় সেই সকল প্রথা, প্রক্রিয়া, কর্মধারা ও ভাবধারা দ্বারা যা কিনা একটি বিশেষ সমাজকে চিহ্নিত করতে সাহায্য করে। সমাজ ও সংস্কৃতি তাই ওতোপ্রোভাবে জড়িত কেননা দুটির ভিত্তি স্থলেই রয়েছে মানবচিন্তা, চেতনা ও ভাবধারা। কথিত আছে মানুষ একা থাকতে পারে না তাই সে সমাজ গঠন করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানব জীবনে সমাজ ও সংস্কৃতি কেবলমাত্র তাঁর বেঁচে থাকার অবলম্বন নয়, তার আশা আকাঙ্খা অভিলাষকে রূপ দেয়ার ক্ষেত্র, তার সীমাবদ্ধ অস্তিত্বকে অসীমে রূপান্তর করার মাধ্যম। এখানেই মানব সমাজ প্রাণীজগত থেকে ভিন্ন।

সমাজ সংস্কৃতি রূপান্তরের ধারা তাই মানবচিন্তা ও ভাবধারাই প্রতিফলন, তবে এই রূপান্তরের আকার ও ধরন কি হবে তা নিয়ে ভিন্নমত আছে চিন্তাবিদদের মধ্যে। উদারনীতিবাদ ভাবধারাই বিশ্বাসীরা মনে করেন যে মানব সমাজের রূপান্তর ক্রমাগতভাবে হয়, অন্যদিকে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির লেখকরা মনে করেন সামাজিক রূপান্তর সাধিত হয় দ্বান্দিকতার মাধ্যমে। একদিকে সামাজিক বিপ্লব যেমন সমাজ রূপান্তরের ধারা হতে পারে, তেমনি সমাজ সংস্কারও রূপান্তরের ইঙ্গিত করে। আবার প্রাচীন চীনের দর্শন দাওবাদ মতে রূপান্তরের ধারা এমনই তরল যা প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখে। অপরদিকে রূপান্তরের মাধ্যম হিসেবে অর্ন্তভূক্ত হতে পারে নারী আন্দোলন, বা গণতন্ত্রের জন্য বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলন।

সামাজিক ও সংস্কৃতিকে রূপান্তরের চালিকা শক্তি হিসেবে কয়েকটি সূচক ধরা যেতে পারে; যেমন সংস্কৃতি, ধর্ম,অর্থনীতি ও প্রযুক্তি। এই প্রবন্ধে এসব সূচক ধরেই গবেষক হিসেবে বুঝাতে চেষ্টা করব বাংলাদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রূপান্তর ধারায় নারী।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট:

একটি স্বাধীন সাবভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের বয়স ৪২ হতে পারে কিন্তু একটি অঞ্চল হিসেবে এর পরিচয় প্রাচীনকাল থেকে। পৃথিবীর অন্যতম বদ্বীপ হিসেবে এর পরিচয় বিশ্বনন্দিত, একই সময় পৃথিবীর অন্যতম জনবহুল দেশ হিসেবে এর ভবিষৎ বিশ্বের দৃষ্টিতে শঙ্কাজনক। কৃষিভিত্তিক এ অঞ্চল কেবলমাত্র অর্ন্তমুখী গ্রামীণ সমাজই জন্ম দেয়নি, প্রাচীনকাল হতে নানা বাণিজ্যপথ, চিন্তা-চেতনা, ও দেশী-বিদেশী মানুষের মিলনক্ষেত্র ছিল এই বাংলা। রেশম পথ দিয়ে তিব্বত থেকে এ দেশের দ্রব্যাবলী রফতানি হয়েছে রোমান সামাজ্যের কাছে। মালদ্বীপ থেকে সওদাগররা মিলিত হয়েছে আর্মেনিয়ানদের সঙ্গে, নদীপথে ইউরোপীয় দেশ থেকে আগত জলদস্যুরা রুপ নিয়েছে ঔপনিবেশিক শক্তিরূপে। প্রাক ঔপনিবেশিক এদেশের ধান পূর্ব মালাক্কা থেকে পশ্চিমের গোয়া পর্যন্ত মানুষকে অন্ন দিয়েছে ও এ অঞ্চলের তাতীঁরা বিশ্বের দরবারে উপহার দিয়েছে রেশম ও মসলিন বস্ত্র।

বৌদ্ধধর্মের পীঠস্থান যেমন ছিল এই বদ্বীপ তেমনি ছিল হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের লীলাক্ষেত্র। খৃষ্টধর্মের আবির্ভাবও মেনে নিয়েছিল এই অঞ্চলের জলবায়ু, আবহাওয়া। বর্তমান বাংলাদেশ বুঝতে গেলেও আত্মস্থ করতে হয় এই ভাষাগত, ধর্মীয় ও আঞ্চলিক বৈচিত্র্য। বাংলাদেশের আধুনিক স্বত্তা যুগ যুগ

ধরে এই উদারতার চর্চা ও অন্তহীন রূপান্তরের ফসল। স্বাধীন বাংলাদেশের আবির্ভাব ও উত্তরণকেও তাই দেখতে হবে পরিবর্তন ও বৈচিত্র্যের লেন্স দিয়ে।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রূপান্তরের ধারা

বাংলাদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রূপান্তরের ধারার ব্যাখ্যা করা যায় এক এক করে, এক এক সূচক ধরে। সূচকগুলো হচ্ছে: কৃষি বা গ্রামীণ সমাজ ও নগরায়ন, পরিবারের ধরন, ভাষা, ধর্ম, জাতিত্ববোধ ও সার্বজনীনতা, রাষ্ট্রীয় পরিসর, নাগরিত্ব ও বহুবিধ আন্দোলন, শিক্ষা, প্রযুক্তি, বিশ্বায়ন ও পরিবেশ।

কৃষিভিত্তিক বা গ্রামীণ সমাজ ও নগরায়ণ

একসময় বাংলার গ্রামীণ সমাজে যৌথ পরিবার বা একান্নবর্তী পরিবারই প্রধান ছিল। কিন্তু ইদানীং একক পরিবারের ধরনটি প্রাধান্য বিস্তার করছে শহর ও গ্রামে। সম্প্রতি একটি জরিপে দেখা দেখে যে ১০০০ টি গৃহস্থালীর মধ্যে শতকরা ৬০% ভাগ পরিবারই একক। তারপর একান্নবর্তী পরিবার (২৬.৩%) আর যৌথ পরিবারের সংখ্যা শতকরা ৯.৮%। একক পরিবারের উর্ধ্বগতির পিছনে রয়েছে জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপ, কৃষিজ জমির স্বল্পতা ও বিভাজন এবং নগর অভিমুখে অভিবাসন। অন্যদিকে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এমণ কিছু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবির্ভাব যারা কৃষিখাতের চাইতে অকৃষিখাতের উপর বেশি নির্ভরশীল। যেমন, দোকানদারি, ছোট ব্যবসা, ভ্যান ও রিকসাচালানো ইত্যাদি। জাতীয় পর্যায়ে ব্যবসার খাতও বর্ধিত হচ্ছে। একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, সাংসদদের সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থান বিচার করলে দেখা যায় যে, অধিকাংশ সাংসদই ব্যবসায়ী পরিবারের অর্ন্তগত। অন্যদিকে দেখা যায় যে, কৃষিখাত বর্তমানে জাতয়ি আয়ের শতকরা ১৯ ভাগ গঠন করে, আর অকৃষিখাত থেকে আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। কৃষিখাতের উন্নয়ন ও পরিবর্তন সবসময় নেতিবাচক ভূমিকা পালন করছে এটা ভাববার কোন অবকাশ নেই। কেননা স্বাধীন হওয়ার ঠিক পরবর্তী সময়ে যেমন বিশ্বে বাংলাদেশ আর্ন্তজাতিকভাবে দুর্যোগপূর্ণ দেশ হিসেবে পরিচিত হত, সেটি এখন

পরিবর্তিত হয়ে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ দেশ হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। এই অসাধ্য সাধন হয়েছে দেশের কৃষক ও কৃষিবিদদের সহযোগিতায়। সেচ পদ্ধতির উন্নয়ন ও পরিধি বৃদ্ধির কারণে এক ফসলা জমি তিন ফসলা হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় শস্য বহুমুখীকরণ হয়েছে ফলে কৃষিভিত্তিক উৎপাদন বেড়েছে। নতুন ধরনের বীজ উদ্ভাবনের ফলে উত্তরবঙ্গে মঙ্গার প্রকোপ কমেছে। ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে নতুন নতুন ফসল উৎপাদন হচ্ছে যেমন পঞ্চগড়ে চা, নীলফামারীতে কমলা ও ভুট্রা ও পার্বত্য চট্রগ্রামে স্ট্রবেরা। এতে যেমনি খাদ্য নিরাপত্তা বেড়েছে, তেমনি জমজমাট হয়েছে কৃষির আভ্যন্তরীণ বাজার। এমনকি আমাদের খাদ্যাভাসেরও পরিবর্তন হয়েছে।

ভাষা

যেকোন মানব সমাজ ও সংস্কৃতিতে ভাষা একটি মুখ্য ভূমিকা পালন করে। মহান ভাষাদিবস ও ভাষা আন্দোলন আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতি এমনকি রাজনৈতিক অস্তিত্বের সঙ্গে গ্রন্থিত। ভাষা আন্দোলন কিভাবে একটি সমাজের চিন্তা-চেতনা ও অগ্রসরতাকে শাণিত করতে পারে ও এক নতুন রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপনে ভূমিকা রাখে বাংলাদেশ তারই এক উজ্জল দৃষ্টান্ত। তাই মনে করি ইউনেসকো ঘোষণার মাধ্যমে ২১ শে ফেব্রুয়ারীকে আমরা বিশ্বের দাড়গোড়ায় পরিচিত করতে পেরেছি ও আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে। এই রূপান্তরের শিক্ষা বোধহয় আমাদের নিজেদেরই নিতে হবে আগে এবং সেটা বাংলাদেশেরই আঙ্গিকে। অর্থাৎ এর মাধ্যমে আমাদেরকে স্বীকৃতি দিতে হবে যে বাংলাদেশে কেবলমাত্র বাংলাভাষাভাষি লোক নেই, আছে অনেক ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী, আদিবাসী সমাজ দলিত সম্প্রদায় যাদেরকে উপনিবেশিক ও প্রাকউপনিবেশিক আমলে নিয়ে আসা হয়েছে পাশ্ববর্তী অঞ্চল থেকে। যেমন চা বাগানের শ্রমিক, বননির্ভর আদিবাসী, ও স্থানচ্যুত অভিবাসী। যারা ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, সাঁওতাল পরগণা ও পশ্চিম বাংলা থেকে এসেছে। তাদের মাতৃভাষা ভিন্ন ।যেমন, তেলেগু, ভোজপুরি, উর্দূ ও সাঁওতাল ভাষা। এছাড়াও এদেশে রয়েছে অনেক আদিবাসী যাদের নিজ নিজ ভাষা রয়েছে, যেগুলোর অনেকটাই লিখিত আকারে রয়েছে আবার অনেকগুলো নেই। বেশিরভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতেই এইসকল মাতৃভাষার মাধ্যমে

শিক্ষা দেয়া হয়না এখনো। তাই মাতৃভাষার শিক্ষাদানকে কর্মসূচী হিসেবে গ্রহণ করার জোর দাবী জানিয়েছে এসব প্রান্তিক গোষ্ঠীরা। যে দেশ জন্মেছে মাতৃভাষাকে আলিঙ্গন করে, রাষ্ট্রীয়ভাষাকে বিশ্ববাসীর কাছে পরিচিত করে। হেঁট সে দেশের মৌলিক কর্তব্য তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

বাংলাদেশের সমাজ সংস্কৃতিতে অপর একটি দিক লক্ষণীয় সেটি হচ্ছে বাংলার আঞ্চলিক ভাষাগুলো। বাংলাভাষায় আমরা নিজ জেলা বা উপজেলাকে ও দেশ বলি। অঞ্চলপ্রীতি তাই আমাদের সংস্কৃতিতে লোকজধারাকে সমৃদ্ধ করেছে। এর প্রমাণ পাওয়া যায় পুঁথিপাঠে ও লোকজ গানে।বাংলা একাডেমী স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলার আঞ্চলিক ভাষার অভিধান প্রকাশ করে তাই বিশ্বনন্দিত হয়েছে। আবার এটাও সত্য যে আঞ্চলিকতার কিছু নেতিবাচক দিক রয়েছে, নিজ অঞ্চলকে সব বিষয়ে প্রাধান্য দেয়া, সেটা প্রাসঙ্গিক হোক বা না হোক। কিন্তু এটাও ঠিক যে অনেক সময় আঞ্চলিক ভাষা কেটি যোগাযোগের সেতুবন্ধন তৈরী করে যা ব্যতীত ঐ অঞ্চলের উন্নতি করা দুঃসাধ্য, বাংলাদেশেই রয়েছে এমন উদাহরণ। এ দৃষ্টান্ত একটি আঞ্চলিক ভাষাকে নিয়ে সেটি হচ্ছে চট্রগ্রাম। আমরা জানি পার্বত্য চট্রগ্রামে রয়েছে ১৪টি ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী যাদের ভাষা ভিন্ন ভিন্ন। তারা এক অপরের সাথে কথোপকথন করে তাদের সান্নিধ্যে যে বৃহত্তম গোষ্ঠীর ভাষা আছে তার মাধ্যমে, যেমন রাঙ্গামাটি খাগড়াছড়িতে চাকমা ও বান্দরবনে মারমা ভাষা। কিন্তু এ বাদেও ব্যপকভাবে ব্যবহার করা হয় চট্রগ্রামের ভাষা বিশেষকরে আন্তঃজেলা যোগাযোগ। অন্যদিকে মায়নমার থেকে যে আরাকানী মুসলমানেরা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের অত্যাচারে বিতাড়িত হয়ে এসেছে বাংলাদেশে আশ্রয় নিতে তারাও ব্যবহার করছে স্থানীয় চট্রগ্রামের ভাষার একটি রূপ। এতে তাদের দুঃখ দুর্দশা প্রকাশ করতে সুবিধা হয় এবং বাংলাদেশের পক্ষেও তা সুবিধাজনক। বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার বৈচিত্র্য ও চর্চা তাই বাংলার সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে।

রাষ্ট্রীয় পরিসর ও নাগরিকত্ব

বাংলাদেশে এখনও অনেকেই আছেন যারা একাধারে তিনটি রাষ্ট্রীয় পরিসরে বাস করেছেন- বৃটিশ ভারত, পূর্ব পাকিস্থান ও স্বাধীন বাংলাদেশ। এই তিনটি পরিসর তৈরী করেছে তিন ধরনের

নাগরিকত্ব। প্রথমটি উপনিবেশিক পাত্র হিসেবে, দ্বিতীয়টি দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে এবং তৃতীয়টি স্বাধীন দেশের নাগরিকত্ব। কিন্তু এই নাগরিকত্ব বাংলাদেশের সকল জনগোষ্ঠী কি সমানভাবে পেয়েছে। কোন গোষ্ঠী যদি অধিকার বঞ্চিত হয়ে থাকে তাহলে সে পূর্ণ নাগরিক অধিকার অর্জনের জন্য গণতান্ত্রিক আন্দোলন বা সংগ্রাম চালাবে এটাই স্বাভাবিক। বাংলাদেশের সমাজ প্রেক্ষাপটেও এ ধরনের অধিকার আন্দোলন রয়েছে। তাদের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য আদিবাসীদের জাতিস্বত্তা স্বীকৃতির আন্দোলন(যেটি উপরে বর্ণিত হয়েছে), সদ্য সংঘটিত দলিত সম্প্রদায়ের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম ও নারী অধিকার আন্দোলন প্রভৃতি। এখানে আমি নারী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের নারী সমাজের পরিবর্তনের প্রসঙ্গ নিয়ে আসব।

১৯৮০ এর দশক থেকে ২০০৯ পর্যন্ত নারী স্বাক্ষরতার হার বেড়েছে প্রায় শতকরা ৩৩ ভাগ আর পুরুষের বেড়েছে শতকরা ২১ ভাগ। একই সঙ্গে বেড়েছে নারীদের শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণ। এই পরিস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবে নারী অধিকারের দাবিগুলো জোরদার হয়েছে। যেমন, সমান কাজে সমান মজুরি, শিক্ষাক্ষেত্রে সমান অংশগ্রহণ, গৃহ ও বাসস্থানের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা। ইদানিংকালে শেষের দাবিটি জোরদার হয়েছে যেহেতু কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু তাদের সমান মর্যাদার জন্য গৃহে এবং বাইরে তাদের সমান্তরালভাবে লড়তে হচ্ছে পুরুষ আধিপত্যের বিরুদ্ধে। নারী আরও দাবি জানিয়েছে তার নিজ সংসারে যাতে সে অধিকার, সম্মান পায়। বিশেষভাবে বৈবাহিক সর্ম্পকে, বিচ্ছেদ প্রক্রিয়ায় ও উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে যেগুলির ব্যাপারে নারীরা এখনও ধর্মীয় আইনের নিষেধাজ্ঞায় অন্তরীণ। বাংলাদেশের সমাজে নারী বেগম রোকয়োর আমল থেকে অনেক এগিয়ে এসেছে বটে কিন্তু একই সঙ্গে তাদের লড়াই ও সংগ্রামের জায়গাটা আগের মতোই অপরিবতিত।

বিশ্বায়ন

এ পর্যন্ত যে সকল সামজিক ও সাংস্কৃতিক রূপান্তরের কথা বলা হয়েছে তা কমবেশি বাংলাদেশের অভ্যান্তরীণ বিষয় দ্বারা প্রভাবিত। কিন্তু একই সঙ্গে বাংলাদেশ বহিবিশ্বের সঙ্গে যুক্ত এবং এই যুক্ততা

কি ধরনের রূপান্তর নিয়ে আসছে বাংলাদেশের সমাজে তাই বুঝবার চেষ্টা করব এখানে। অনেকের মতে হচ্ছে যে বিশ্বায়ন বাংলাদেশের জন্য নতুন কোন ঘটনা বা পর্যায় নয়। কথাটা আংশিক সত্য কেননা এর আগেই বর্ণনা করেছি যে বাংলা নামে এই অঞ্চলটি প্রাক উপনিবেশিক যুগ থেকেই বিশ্বের সঙ্গে বাণিজ্যের মাধ্যমে যুক্ত ছিল। তবে বিংশ ও একবিংশ শতাব্দির যে বিশ্ব ও বিশ্বায়ন প্রকোপ দেখা যায় তা আগের থেকে ভিন্নতর।

প্রাক উপনিবেশিক আমলে বৃহত্তর বাংলা যে আর্ন্তজাতিক খ্যাতি অর্জন করেছিল, বাণিজ্যিক শক্তি হিসেবে, উপনিবেশিক আমলে বৃহত্তর বাংলা যে আর্ন্তজাতিক খ্যাতি অর্জন করেছিল, বাণিজ্যিক শক্তি হিসেবে,উপনিবেশিক আমলে তা পরিণত হয় উপনিবেশিক সাবজেক্ট হিসেবে। আর উপনিবেশিক উত্তর যুগে বাংলাদেশ ক্রমশই সম্পৃক্ত হয় বৈশ্বিক ধনতান্ত্রিক কাঠামোতে একটি প্রান্তিক দেশ হিসেবে। সাম্প্রতিককালের বিশ্ব অর্থনীতেতে রয়েছে এক ধরনের শ্রম বিভাজন যা কিনা বিভক্ত কেন্দ্রে, আধা প্রান্তে ও প্রান্তে। বাংলাদেশ এক প্রান্তিক পুজিঁবাদী দেশ হিসেবে বিশ্বের নানা জায়গায় কাচাঁমাল ও সস্তা শ্রম বিনিয়োগ করবে আর কেন্দ্রের শক্তিগুলো যেগুলিকে প্রক্রিয়াজাত করে পুনরায় আবার বিশ্ব বাজারে রফতানি করবে।এই কাঠামো অনুযায়ী বাংলাদেশে বিশ্বয়ানের প্রভাব অনেকটা নেতিবাচক হবে এটিই অবশ্যম্ভাবী। তবে প্রকৃতপক্ষে সমাজে ও সংস্কৃতিতে এই প্রভাব ভিন্নধারা বলেও বিবেচনা করা হয়। তারই কিছু উপাদান তুলে ধরব এখানে।

কিন্তু বিশ্বায়নের জোয়ার একতরফা কেন্দ্রের থেকেই বইছে না। প্রান্তিক দেশগুলোর থেকেও প্রভাব অন্যান্য দেশে গিয়ে পড়ছে। প্রথমে সামান্য হলেও পরবর্তিতে আরও শক্তিশালী হবে, এটি আশা করা যায়। অনেক দেশে জাতিসংঘে নিয়োজিত শান্তিরক্ষী বাহীনী হিসেবে আমাদের বাংলাদেশী নিরাপত্তা বাহিনীরা আছেন। তারা বিভিন্ন দেশে গিয়ে এমন সব উৎকৃষ্ট সেবা দিয়েছেন যে অনেক দেশে বাংলা নামে রাস্তাঘাট তৈরী হয়েছে। পশ্চিমা দেশের প্রতিটি বড় শহরে যেমন একটি সময়ে চায়না টাউন ছড়িয়ে পড়েছিল, তেমনি বেশ কয়েকটি দেশে, বাঙ্গালী প্রধান শহর গুলিতে ও ছোট্র বাংলাদেশ হিসেবে পরিচিত প্রবাসী বাংলাদেশীদের বসতি স্থাপিত হয়েছে। যেখানে গেলে পাওয়া

যায় প্রসিদ্ধ ইলিশ মাছ, শাক সবজি ও বাংলাদেশের তৈরী কিছু প্রিয় সামগ্রী। এ ধরনের ধারাকে বাংলাদেশের সমাজে বিশ্বায়নের প্রভাব বলতে প্রথমেই ধরা পড়ে এক জনশক্তি রপ্তানি করা এক দেশ হিসেবে বাংলাদেশের আর্বিভাব। ২০১২ সালে বাংলাদেশে জনশক্তি রপ্তানি দাঁড়ায় .৫০ মিলিয়ন এবং সেই বছরে জনশক্তি রপ্তানি দাঁড়ায় ১০.৯ বিলিয়ন ডলার অর্থাৎ মোট রপ্তানি আয়ের এক চতুর্থাংশ ভাগ। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এই নিয়ে বেশ গর্ব করা হয়, তবে আমরা যদি সমাজের দিকে তাকায় আমরা দেখি এই টাকা বিনিয়োগ হচ্ছে মূলত জমি ক্রয়, রিয়েল এস্টেটে এবং শপিং মল নির্মাণে। এক নব্য শ্রেণীর আর্বিভাব একই সঙ্গে জন্ম দিচ্ছে ভোগবাদী সমাজ ব্যবস্থা। এতে এত বড় বড় শহরের দিগন্ত বদলে যাচ্ছে প্রায় রাতারাতি। এর প্রভাব পড়ছে গ্রামীণ অর্থনীতেতেও। আগেই বলা হয়েছে যে গ্রামীণ অর্থনীতিতে অকৃষিখাতের পরিবৃদ্ধির কথা। তবে আর একটু গভীরে প্রবেশ করলে বুঝতে পারব যে, যে সকল শ্রমিক বিদেশে যাত্রা করছে তারা বেশিরভাগই গ্রামের ছেলে ও মেয়ে। ফলে যে পারিবারিক বিকাশ ও স্বচ্ছলতার ছবি চোখের সামনে প্রতিভাত হচ্ছে, তার সঙ্গে যুক্ত হতে চাইছে গ্রামের যুবক ও যুবতীরা। আর এজন্য শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বাড়ছে বিশেষ করে ইংরেজী শিক্ষার। কেননা বিশ্বজুড়ে ইংরেজিই সাংস্কৃতিক বিশ্বের কারেন্সী হিসেবে মর্যাদা পেয়েছে। এখানে বাংলাদেশ একা নয়, যে সকল দেশে ইংরেজির চল বেশি ছিল না যেমন ফ্রান্স বা জার্মানী সেখানেও বইছে ইংরেজী চর্চার জোয়ার। এই ভাষা চর্চার আগ্রহ দেখা দিয়েছে পাঠ্যসূচিতে। আমার মনে পড়ে এক দশক আগেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় এমনও হত যে ইংরেজি বিভাগের সীটগুলো অপূর্ণ থাকত, কিংবা দেরীতে পূরণ হতো। সে দিন অঅর নেই। মৌখিক পরীক্ষার প্রথম দিনেই ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের বিষয়ের সব আসন পূরণ হয়ে যায়।

অনেক বিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছে সংস্কৃতির বিশ্বায়ন। আর এই ধরনের বিশ্বায়নকে জগতবাসীর কাছে পরিচিত করতে হলে প্রয়োজন প্রচুর পরিমাণ গবেষণা ও বাংলা ভাষার অনূদিত মৌলিক রচনাবলী।

এই সূত্রে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আলোচনা করতে হয়, সেটি হল প্রযুক্তি। ডিজিটাল বাংলাদেশের আকাঙ্খা যদি আমাদের বাস্তবায়ন করতে হয় তাহলে নতুন প্রযুক্তির যথার্থ প্রয়োজন ছাড়া তা সম্ভব

নয়। এই সত্য বাংলাদেশের জনগণ যে হৃদঙ্গম করেছে তা বোঝাই যায়। যেমন, বোঝা যায়, স্যাটেলাইট টিভির জনপ্রিয়তা বেড়েছে। কেবলমাত্র শহরে নয়,প্রত্যন্ত এলাকায় এই প্রযুক্তির নানাবিধ ব্যবহার সাধারণ মানুষের জীবনযাপনকে সহজতর করতে এবং সেবা দিতে সক্ষম হয়েছে।

একটি সময় ছিল বাংলাদেশে যখন একটি টেলিফোন লাইনের সংযোগ পেতে হলে মাসের পর মাস,বছরের পর বছরের অপেক্ষা করে থাকতে হত। এখন উন্মুক্ত বাজারে সহজেই এক একজনের আয় উপযোগী সেলফোন ও সিমকার্ডের বিনিময়ে হাতের কাছে এসে গেছে পৃথিবী। এর ফসল যারা পেয়েছে তারা আবার পেছনে ফিরতে নারাজ।

পরিশেষে যে বিষয়টি আলোচনা না করলেই নয় সেটি হচ্ছে বিশ্বব্যাপী জলবায়ুর পরিবর্তন যেখানে বাংলাদেশের ভৌগলিক ও প্রাকৃতিক অবস্থানের বিচারে একটি নাজুক পরিস্থিতি স্বীকার করে নিতে হবে। জলবায়ুর পরিবর্তন সারা বিশ্বকেই প্রভাবিত করবে সুতরাং কোন দেশই তা এককভাবে মোকাবেলা করতে পারবে না। এতে যে বিভিন্ন দেশের মধ্যে ঘনিষ্ট যোগাযোগ বৃদ্ধি পাবে তাতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে তার দ্রুত প্রভাব পড়বে। ভৌগলিক ও সামজিক সীমারেখাকে নিয়ে নতুনভাবে চিন্তা করতে হবে। বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় জলবায়ু পরিবর্তনের নানা প্রাকৃতিক প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে যেমন, জলাবদ্ধতা, অতিরিক্ত আর্দ্রতা ও শৈতপ্রবাহ। মানুষ তাদের নতুন বসতি স্থাপনে চলাচল করছে দেশের ভিতরে ও বাইরে, পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে কিংবা সুদূর মহাদেশে, যেখানে সুযোগ পাচ্ছে।বাংলাদেশের সামাজিক সাংস্কৃতিক ধারা তাই আরও পরিবর্তনের অপেক্ষায় রয়েছে। প্রশ্ন জাগে কোন দিকে এবং কার নিয়ন্ত্রণে।[৩০]

৩০.ঠাকুরতা গুহ মেঘনা, রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস, বাংলাদেশ,রিইব।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৬.১.ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ

৬.২.ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের ভর্তির অধিকার ও সহশিক্ষার সূচনা

৬.৩.ভাষা আন্দোলন ও ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে নারীদের অংশগ্রহণ

৬.৪.পাকিস্তান আমলে ও স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নারী-নেত্রীদের সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকান্ড

ষষ্ঠ অধ্যায়

৬.১.ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমানে সবচেয়ে পুরাতন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। এটি ঢাকা শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত। এখানে প্রায় ৩৩৫০০ ছাত্র-ছাত্রী এবং ১৮০৫ জন শিক্ষক রয়েছে। এটি ১৯২১ সালে স্থাপিত হয়। প্রতি বছর এখানে প্রায় ৫০০০ ছাত্র ভর্তি হয়। বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী।

অবস্থান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকার প্রায় কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। এর উত্তর দিকে নিউ এলিফ্যান্ট রোড। পশ্চিমে ইডেন কলেজ, দক্ষিণে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, পূর্বে কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ।

ইতিহাস

নবাব সৈয়দ নবাব আলী চৌধুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রস্তাবক। ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসনকালে স্বাধীন জাতিস্বত্তার বিকাশের লক্ষ্যে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া শুরু হয়। ১৯১২ সালের ২রা ফ্রেবুয়ারী ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেন তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ।এর মাত্র তিনদিন পূর্বে ভাইসরয় এর সাথে সাক্ষাৎ করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আবেদন জানিয়ে ছিলেন ঢাকার নবাব স্যার সলিমুল্লাহ, ধনবাড়ীর নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী, শেরে বাংলা এ.কে.ফজলুল হক এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। ২৭ মে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তাব করেন ব্যরিস্টার আর. নাথানের নেতৃত্বে ডি আর কুলচার, নবাব সিরাজুল ইসলাম, ঢাকার প্রভাবশালী নাগরিক আনন্দ চন্দ্র রায়, ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ ডব্লিউ এ টি আর্চিবোল্ড [জগন্নাথ কলেজের অধ্যক্ষ ললিত মোহন

চট্রোপাধ্যায়, বর্তমান কবি নজরুল সরকারি কলেজের তত্ত্বাবধায়ক শামসুল উলামা আবু নসর মুহাম্মদ ওয়াহেদ, মোহাম্মদ আলী (আলীগড়), প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ এইচ এইচ আর জেমস, প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক সি ডব্লিউ পিক এবং সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ সতীশচন্দ্র আচার্য। ১৯১৩ সালে প্রকাশিত হয় নাথান কমিটির ইতিবাচক রিপোর্ট এবং সেবছরই ডিসেম্বর মাসে সেটি অনুমোদিত হয়। ১৯১৭ সালে গঠিত স্যাডলার কমিশনও ইতিবাচক প্রস্তাব দিলে ১৯২০ সালের ১৩ মার্চ ভারতীয় অআইন সভা পাশ করে " দি ঢাকা ইউনিভার্সিটি এ্যাক্ট (অ্যাক্ট-১৩) ১৯২০"।

ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার উন্মুক্ত হয় ১৯২১ সালের ১লা জুলাই। সে সময়ে ঢাকার সবচেয়ে অভিজাত সৌন্দর্যমন্ডিত রমনা এলাকায় প্রায় ৬০০ একর জমির উপর পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের পরিত্যাক্ত ভবনাদি এবং ঢাকা কলেজের (বর্তমান কার্জন হলের)ভবনসমূহের সমন্বয়ে মনোরম পরিবেশে গড়ে উঠে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রতিষ্ঠার এই দিনটি প্রতিবছর " ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় " দিবস হিসেবে পালন করা হয়।তিনটি অনুষদ ও ১২ টি বিভাগ নিয়ে একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে এর যাত্রা শুরু হয়। কলা, বিজ্ঞান ও আইন অনুষদের অর্ন্তভুক্ত ছিল সংস্কৃত ও বাংলা, ইংরেজী, ইতিহাস, আরবী, ইসলামিক স্টাডিজ, ফারসী, উর্দু, দর্শন, অর্থনীতিও রাজনীতি,পর্দাথবিদ্যা, রসায়ন, গণিত এবং আইন।

প্রথম শিক্ষবর্ষে বিভিন্ন বিভাগে মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৮৭৭ জন এবং শিক্ষক ছিল মাত্র ৬০ জন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রী লীলা নাগ (ইংরেজী বিভাগ; এমএ-১৯২৩)। যেসব প্রথিতযশা শিক্ষাবিদ বিশ্ববিদ্যালয়ের এর প্রতিষ্ঠালগ্নে শিক্ষকতার সাথে জড়িত ছিলেন তারা হলেনঃ হরপ্রসাদ শাত্রী, এফ. সি. টার্নার, মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, জি. এইচ.ল্যাংলি, হরিদাস ভট্রাচার্য, ডব্লিউ এ জেনকিন্স, রমেশচন্দ্র মজুমদার, স্যার এ এফ রাহমান, সতোন্দ্রনাথ বসু, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত,জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন অস্থিরতা ও ভারত বিভক্তি আন্দোলনের কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর অগ্রযাত্রা কিছুটা ব্যহত হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান নামক দুইটি স্বাধীন

রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়।তৎকালীন পূর্ববঙ্গ তথা পূর্ব পাকিস্থানের রাজধানী ঢাকয় অবস্থিত প্রদেশের একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্র করে এদেশের মানুষের আশা-আকাঙ্খা উজ্জীবিত হয়। নতুন উদ্যামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর কর্মকান্ড শুরু হয়। তৎকালীন পূর্ববাংলায় ৫৫ টি কলেজ এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হয়।১৯৪৭-৭১ সময়ের মধ্যে ৫টি নতুন অনুষদ,১৬টি নতুন বিভাগ ও ৪টি নতুন ইনিস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের রয়েছে গৌরবময় ভূমিকা।স্বাধীনতা যুদ্ধে এ বিশ্ববিদ্যালয় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আক্রমনের শিকার হয়। এতে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং ছাত্র-ছাত্রীসহ নিহত হয়েছেন বহুজন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের কঠোর নিয়ন্ত্রণে রাখার লক্ষ্যে ১৯৬১ সালে স্বৈরাচারী আইয়ুব খানের সরকার প্রবর্তিত অর্ডিন্যান্স বাতিলের জন্য ষাটের দশক থেকে শিক্ষকদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে স্বাধীনতার পর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ উক্ত অডিন্যান্স বাতিল করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডার-১৯৭৩ জারি করে। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় এই অর্ডার দ্বারা পরিচালিত হয়ে আসছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্ন্তগত প্রতিষ্ঠান

দেশের সর্বপ্রাচীন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে ১০টি অনুষদ, ৫১ টি বিভাগ,৯টি ইনিস্টিটিউট এবং ৩৩ টি গবেষণা কেন্দ্র রয়েছে। এছাড়া ছাত্র-ছাত্রীদের থাকার জন্য রয়েছে ২০টি আবাসিক হল ও হোস্টেল।

অনুষদসমূহ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনুষদ ও এর অর্ন্তগত বিভাগ গুলো হলঃ

কলা অনুষদ

অপরাজেয় বাংলা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনের সামনে অবস্থিত একটি ভাস্কর্য।

প্রতিষ্ঠাকাল ঃ **১৯২১**

বিভাগসমূহঃ

১.বাংলাঃ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই বাংলা বিভাগ এর কার্যক্রম শুরু করে। এ বিভাগের প্রথম অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান ছিলেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।**১৯৫২** সালে ভাষা আন্দোলনের সময় এই বিভাগের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

২.ইংরেজী

ইংরেজী বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমবয়স্ক। ইংরেজী বিভাগের অনেক শিক্ষক ও ছাত্র ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। দুজন শিক্ষক ড. জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা এবং জনাব রাশিদুল হাসান এবং ৭ জন ছাত্র **১৯৭১** এ শহিদ হন।

৩.ফারসি ও উর্দু

১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে কয়টি বিভাগ নিয়ে কার্যক্রম শুরু করে ফারসী ও উর্দু তার মধ্যে অন্যতম।

৪.দর্শন

দর্শন বিভাগের শুরু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে। ১৯৫২-৫৩ শিক্ষাবর্ষে দর্শন বিভাগ "দর্শন ও মনোবিজ্ঞান " নামে পরিচিত লাভ করে।১৯৬৫ সালের আগস্ট মাসে মনোবিজ্ঞান বিভাগ দর্শন বিভাগ থেকে আলাদা হয়ে যায়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সূচনালগ্নে শহীদ হন দর্শন বিভাগের অধ্যাপক ও তৎকালীন বিভাগীয় প্রধান ড. গোবিন্দ চন্দ্র দেব।

৫.ইতিহাস

১৯২১ সালোর ১ লা জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথেই ইতিহাস বিভাগের যাত্রা শুরু হয়। ত্রিশের দশক থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামে এই বিভাগের ভূমিকা অপরিসীম। মুক্তিযুদ্ধে এই বিভাগের ৩ জন শিক্ষক ও ৩ জন ছাত্র শহীদ হন।

৬.আরবী

১৯২১ সালে আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী শিক্ষা শুরু হয়।

৭.ইসলামিক স্টাডিজ

১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ ১৯৮০ সালে বিভক্ত হয়ে স্বতন্ত্র ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

৮. ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি

১৯৪৮ সালে ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়।

৯. সংস্কৃত ও পালি

সংস্কৃত ও পালি ভাষা সাহিত্য এ উপমহাদেশের প্রাচীন শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, দর্শন, ও ইতিহাসের বাহন প্রধান।এ অঞ্চলের অতীত ঐতিহ্যময়তার সঙ্গে সংস্কৃত ও পালির সর্ম্পক অবিচ্ছেদ্য। ১৯২১ সাল থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ও পালি বিষয়ক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়।

১০.তথ্য বিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা

একসময়ে গ্রন্থাগার তথ্য বিজ্ঞান নামে পরিচিত ছিলো এই বিভাগটি।

১১. ভাষাতত্ত্ব

১২.নাট্যকলা ও সঙ্গীত

১৩.বিশ্ব ধর্মতত্ত্ব

বিজ্ঞান অনুষদ

১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্টালগ্ন থেকে বিজ্ঞান অনুষদ এর শিক্ষা গবেষনা কার্যক্রম শুরু হয়। প্রথমে পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন, ও গণিত এই তিনটি বিভাগ নিয়ে এই অনুষদ যাত্রা শুরু করে।বিজ্ঞান অনুষদের অধীনে কয়েকটি কেন্দ্র আছে। এগুলো হল বোস সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড স্টাডিজ অ্যান্ড রির্সাচ, সেমি কন্ডাক্টার টেকনোলজি রির্সাচ সেন্টার, রিনিউয়েবল এনার্জি রিসার্চ সেন্টার, বদ্বীপ গবেষণা কেন্দ্র, দুর্যোগ গবেষণা প্রশিক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র।

কার্জন হল-মূল ভবন

বিভাগসমূহ

১.পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ

১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত বারটি বিভাগের একটি হল পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ।

২.গণিত বিভাগ

১৯২১ সালে প্রখ্যাত গণিতবিদ অধ্যাপক ভূপতি মোহন সেন ও ড. নলিনীমোহন বসুর নেতৃত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের কার্যক্রম শুরু হয়।

৩.রসায়ন বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগ বাংলাদেশের একটি অন্যতম ঐতিহ্যবাহী বিভাগ। ১৯২১ সালে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সাথেই এই বিভাগের শুরু।

৪.পরিসংখ্যান বিভাগ

বাংলাদেশে প্রথম একাডেমিক ভাবে স্বীকৃত পরিসংখ্যানবিদ ও সাহিত্যিক অধ্যাপক ডঃ কাজী মোতাহের হোসেন ছিলেন এর প্রথম বিভাগীয় প্রধান।বাংলাদেশের পরিসংখ্যান শিক্ষা ও গবেষণা বিস্তারে সূদুরপ্রসারী চিন্তাভাবনা করে মাত্র একজন সুদক্ষ পরিসংখ্যানবিদ শহীদ অধ্যাপক এ এন এম মুনিরুজ্জামানকে নিয়ে ১৯৫০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিসংখ্যান বিভাগের গোড়াপত্তন করেন। কাজী মোতাহের ছিলেন এর বিভাগীয় প্রধান।

৫. ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ

১৯৪৭-৪৮ সালে অধ্যাপক নাফীস আহমেদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় ভূগোল বিভাগ

৬.ভূতত্ত্ব বিভাগ

১৯৪৯ সালে ভূতত্ত্ব বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়।

৭.ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান ও ইলেকট্রনিক্স বিভাগ

১৯৬৫ সালে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে মাত্র ২৫ জন ছাত্র নিয়ে ফলিত পদার্থবিদ্যা বিভাগের যাত্রা শুরু হয়। অধ্যাপক শাহ মোঃ ফজলুর রহমান বিভাগের প্রতিষ্ঠা চেয়ারম্যান ছিলেন।

৮. ফলিত রসায়ন ও রাসায়নিক প্রযুক্তি বিভাগ

ফলিত রসায়ন ও রাসায়নিক প্রযুক্তি বিভাগের জন্ম হয় ১৯৭২ সালে। রসায়ন, রাসায়নিক প্রযুক্তি ও রাসায়নিক প্রকৌশল সমন্বয়ে কোর্স কারিকুলাম এমনভাবে তৈরী করা হয়েছে যেন এখান থেকে ডিগ্রিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীরা শিল্প-কারখানায় তাদের জ্ঞান দক্ষতার সাথে প্রয়োগ করতে পারে।

৯. কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ

১৯৯২ সালের ১ লা সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০০৪ সালের ২৭ মার্চ বিভাগের নাম পরিবর্তন করে কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল করা হয়

আইন অনুষদ

১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যে তিনটি অনুষদ নিয়ে যাত্রা শুরু করে াাইন অনুষদ তাদের অন্যতম।১৯৭৩ সাল পর্যন্ত আইন অনুষদের অধীনে দুবছর মেয়াদী স্নাতক কোর্স এল এলবি চালু ছিল। ১৯৭৩-৭৮ শিক্ষাবর্ষ হতে এল এল বি চার বছর করা হয়।

বিভাগসমূহঃ আইন বিভাগ

সামাজিক বিজ্ঞান বিভাগ

প্রতিষ্ঠাকালঃ১৯৭০

বিভাগসমূহ

১.অর্থনীতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের যাত্রাও সেই ১৯২১ সাল থেকেই শুরু। শিক্ষা ও গবেষণার প্রসারে এই বিভাগের সুদীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে।

২.রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

১৯৩৮ সালে অর্থনীতি বিভাগ থেকে আলাদা হয়ে পৃথক একটি স্বতন্ত্র বিভাগ হিসেবে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের যাত্রা শুরু হয়

৩.আর্ন্তজাতিক সর্ম্পক বিভাগ

বর্তমানে পৃথিবীতে এক রাষ্ট্রের সাথে আর এক রাষ্ট্রের আন্তঃসর্ম্পক পর্যালোচনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ভূ-রাজনৈতিক প্রসঙ্গ ছাড়াও এর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানবিক তাৎপর্য রয়েছে। একারনেই ১৯৪৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্ন্তজাতিক সর্ম্পক বিভাগের যাত্রা শুরু হয়

৪.সমাজবিজ্ঞান বিভাগ

প্রয়াত অধ্যাপক এ.কে. নাজমুল করিমের উদ্যোগে ও ইউনিসেফ এর আর্থিক সহায়তায় ১৯৫৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা অনুষদের অধীনে সমাজবিজ্ঞান বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়।

৫. লোক প্রশাসন বিভাগ

১৯৭২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে লোক প্রশাসন বিভাগ চালু হয়

৬.গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ

গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ চালু হয় ১৯৬২ সালে।

৭. নৃবিজ্ঞান বিভাগ

মানব সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতির পঠন, পাঠন ও অধ্যায়ন এবং তত্ত্বানুসন্ধান বিষয়ে একটি জ্ঞাঙ্গত চর্চা হল নৃবিজ্ঞান। ৫ ডিসেম্বর ১৯৯২ সালে ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়ে সামাজিক বিজ্ঞানের একটি স্বতন্ত্র শাখা হিসেবে নৃবিজ্ঞান বিভাগের প্রাতিষ্ঠনিক যাত্রা শুরু হয়।

৮.পপুলেশন সায়েন্সের বিভাগ

১৯৯৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এ পপুলেসন সায়েন্স বিভাগের যাত্রা শুরু হয়। প্রতিবছর ২৫ জন করে ছাত্রছাত্রী নেওয়া হয় এর মধ্যে ১০ টি আসন মেয়েদের জন্য সংরক্ষিত।

৯. উইমেন্স স্টাডিজ বিভাগ

উইমেন্স স্টাডিজ বিভাগ ২০০০ সালের এপ্রিল মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়। অধ্যাপক নাজমা চৌধুরী চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহনের মাধ্যমে বিভাগীয় কার্যক্রম শুরু হয়। এই বিভাগের সাথে নেদারল্যান্ড রয়েল এমব্যাসি এর ৫ বছর মেয়াদী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

১০.ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগ

বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়ন নীতি বিশ্লেষণ তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞানের সমন্বয়ে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০০৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদে দুই বছর মেয়াদী মাস্টার্স অব ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম স্টাডিজ প্রোগ্রামে ভর্তি চালু হয়।

বিজনেস স্টাডিজ বিভাগ

১৯৭০ সালে বাণিজ্য অনুষদ ম্যানেজমেন্ট একাউন্টিং নামে ২ টি বিভাগ নিয়ে যাত্রা শুরু করে। ১৯৭৪ সালে মার্কেটিং ও ফিন্যান্স নামে আরও দুটি নতুন বিভাগের যাত্রা শুরু হয়। ১৬ জুলাই ১৯৯৫ তারিখ থেকে নাম পরিবর্তন করে বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ করা হয়। এ বিভাগে বিবিএ এমবিএ প্রোগ্রামে প্রায় ৬০০০ ছাত্রছাত্রী আছে।

বিভাগসমূহ

ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগ:

১৯৭০সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগ স্থাপিত হয়। জুন ২, ২০০১ পর্যন্ত এই বিভাগের নাম ছিল ব্যবস্থাপনা বিভাগ। জুন ৩,২০০১ সালে এই বিভাগের নামকরন করা হয় ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগ।

একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেম বিভাগ:

একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেম বিভাগ ১৯৭০ সালে ১৪০ জন ছাত্র-ছাত্রী এবং ৮ জন শিক্ষক নিয়ে হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ নামে যাত্রা শুরু করে।

মার্কেটিং বিভাগ

মার্কেটিং বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য অনুষদের অর্ন্তগত একটি বিভাগ যা বাংলাদেশের ব্যবসা শিক্ষা ক্ষেত্রে একটি আর্ন্তজাতিক মানের প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃত।১৯৭৪ সালের ১লা জুলাই এই বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়।

ফিন্যান্স বিভাগ

ফিন্যান্স বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয় ১লা জুলাই ১৯৭৪ সালে।

ব্যাংকিং বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সর্বপ্রথম সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় গুলোর মধ্যে বাণিজ্য অনুষদের অধীনে ব্যাংকিং বিভাগ চালু হয়। ২০০৪ সালের আগষ্ট মাসে এই বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়।

ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম বিভাগ

এই বিভাগটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনিষ্ঠ সদস্য। অধ্যাপক ড: আব্দুল মান্নান চৌধুরীকে প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান নিয়োগের মাধ্যমে ২০০৫ সালের ১২ ই এপ্রিল এই বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়।

জীববিজ্ঞান অনুষদ

১৯৭৪ সালে উদ্ভিদ বিজ্ঞান, প্রাণীবিদ্যা, মৃত্তিকা পানি ও পরিবেশ, ফার্মেসি, প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞান বিভাগ নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞান অনুষদ গঠিত হয়। ১৯৭৯ সালে অনুজীব বিজ্ঞান বিভাগ নামে একটি বিভাগ, ১৯৯৭ সালে চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান ও মৎস্যবিজ্ঞান নামে দুটি নতুন বিভাগ এবং ২০০০ সালে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এ্যান্ড বায়োটেকনোলজি নামে আরও বিজ্ঞান গ্রন্থাগার একটি নতুন বিভাগ এ অনুষদে অর্ন্তভুক্ত হয়। বর্তমানে অনুষদে বিভাগ সংখ্যা ৯ টি। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বিভাগের অনুষদের বিভাগসমূহ জীববিজ্ঞান

বিষয়ক জাতীয় সমস্যা সর্ম্পকিত গবেষণায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে আসছে এবং ইতোমধ্যে জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক স্বীকৃতি প্রশংসা লাভ করেছে। এ অনুষদের বিভাগ সংখ্যা বর্তমানে **১২৫** জন।

বিভাগসমূহ

মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিভাগঃ

১৯৪৯ সালে বর্তমান বিভাগটি মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ নামে প্রতিষ্ঠিত হয়।

উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ

উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীনতম বিভাগ এবং উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিষয়ক দেশের প্রথম বিভাগ।প্রয়াত প্রফেসর মহেস্বরী কর্তৃক **১৯৩৯** সালে জীববিজ্ঞান বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয় ।

প্রাণীবিদ্যা বিভাগ

১৯৫৪ সালে প্রাণিবিদ্যা বিভাগ চালু হয়। প্রয়াত প্রফেসর হাবিবুল্লাহ খান ইউসুফজাই ছিলেন প্রথম বিভাগীয় প্রধান, এর পূর্বে বিভাগটি **১৯৩৯** সালে প্রতিষ্ঠিত জীববিজ্ঞান বিভাগের অধীনেছিল।

প্রাণ রসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান

১৯৫৭ সালে কার্জন হলের শেষ প্রান্তে অবস্থিত চারতলা বিল্ডিংয়ে বিভাগটির পথচলা শুরু হয়। প্রফেসর কামালউদ্দিন আহমেদ এর প্রতিষ্ঠাতা।

মনোবিজ্ঞান বিভাগ

মনোবিজ্ঞান বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনের তৃতীয় তলায় অবস্থিত। এই বিভাগ **১৯৬৫** সালে প্রফেসর ড. মীর ফখরুজ্জামানের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় ।

অণুজীব বিজ্ঞান

১৯৭৯ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হল এলাকায় অবস্থিত প্রাণীবিদ্যা ভবনের প্রথম তলার একটি অংশে অণুজীব বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হয়।

মৎস্য বিজ্ঞান

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মৎস্যখাতের গুরুত্ব অনুধাবন করে ১৯৯৭-৯৮ শিক্ষাবর্ষ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাকুয়াকালচার ও ফিশারিজ বিভাগের কার্যক্রম শুরু হয়। গত ২৯ শে মার্চ ২০০৪ তারিখে এ বিভাগের নাম পরিবর্তন করে মৎস্যবিজ্ঞানকরা হয়।

চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডন এর সঙ্গে লিংক প্রোগামের অধীনে ব্রিটিশ department of international development (DFID) অর্থানাকুল্যে এবং ১২ জন ব্রিটিশ বিশেষজ্ঞের সহায়তায় ১৯৯৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোবিজ্ঞান বিভাগের অধীনে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি কোর্সটি চালু হয়।

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড বায়োটেকনোলজি

বিভাগটি কার্জন হলের পিছনে অবস্থিত।অধ্যাপক ডঃ আনোয়ার আজিম আকন্দ এই বিভাগের প্রধান।

ফার্মেসী অনুষদ

প্রতিষ্ঠাকালঃ ১৯৯৫

বিভাগসমূগঃ

১. ফার্মাসিউটিক্যাল কেমেস্ট্রি

২. ক্লিনিক্যাল ফার্মেসি এন্ড ফার্মাকোলজি

৩. ঔষুধ প্রযুক্তি

অন্যান্য অনুষদ

- চিকিৎসা অনুষদ
- স্নাতকোত্তন চিকিৎসা বিজ্ঞান অনুষদ
- শিক্ষা অনুষদ

ইনিস্টিটিউট সমূহ

১. শিক্ষা ও গবেষণা ইনিস্টিটিউট

২. পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইনিস্টিটিউট

৩. ব্যবসায় প্রশাসন ইনিস্টিটিউট

৪. পুষ্টি ও বিজ্ঞান ইনিস্টিটিউট

৫. চারুকলা ইনিস্টিটিউট

৬. সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনিস্টিটিউট

৭. আধুনিক ভাষা ইনিস্টিটিউট

৮. স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইনিস্টিটিউট

৯. তথ্য প্রযুক্তি ইনিস্টিটিউট

৬.২.ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের ভর্তির অধিকার ও সহশিক্ষার সূচনা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের ভর্তির অধিকার ও সহশিক্ষার সূচনা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ্যাক্ট অনুযায়ী নারী-পুরুষ নির্বিশেষে যে কোন ধর্ম-বর্ণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা উন্মুক্ত ছিল। কিন্তু **১৯২১** সালে বেথুন কলেজের ইংরেজিতে অর্নাস পাশ করা প্রথম ছাত্রী লীলা নাগ এম.এ. তে সহজে ভর্তি হতে পারে নি। সে যুগের পরিবেশে সহশিক্ষার পরিবেশ খুব সহজ ছিল না। তাই উপাচার্য পি.জে হার্টগ ও চ্যান্সেলর এর সহায়তায় লীলা নাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার সুযোগ লাভ করেন। একই বছর অর্থনীতিতে অর্নাস নিয়ে সুষমা সেন গুপ্ত নামে আরেক জন ছাত্রী ভর্তি হন। এভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নারী শিক্ষার দ্বার উন্মোচিত হল। প্রথম দিকে উপাচার্যের স্ত্রীর তদারকিতে ছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতায়াত করত। পরবর্তীতে তাদের তত্ত্বাবধানের জন্য লোক নিয়োজিত হয়। ছাত্রীরা কমনরুমে থাকতো, শিক্ষকরা প্রতি ক্লাসে তাদের ডেকে নিয়ে যেতেন ও ক্লাস শেষে পৌঁছে দিতেন। ক্লাসরুমের সামনের বেঞ্চে মেয়েদের বসার ব্যবস্থা ছিল। ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে আলাপচারিতার কোন সুযোগ ছিল না। প্রক্টরের অনুমতি সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় নোট আদান প্রদান করা যেত।

বিখ্যাত বুদ্ধদেব বসু তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র অবস্থার (১৯২৭-৩১) স্মৃতিচারণ করে ছাত্রীদের সর্ম্পকে বেশ মজার কিছু বিষয় উপহার দিয়েছেন-" বিশ্ববিদ্যালয়ের আবহাওয়াটি সত্যিই উদার, কিন্তু এর একটি ব্যতিক্রম উল্লেখযোগ্য; একমুঠো ছাত্রীও আছেন আমাদের সঙ্গে- আছেন এবং অনেক বিষয়েই নেই। যেমন দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক, পৃথক্কৃত ও সুরক্ষিত অতি সুকুমার উপবংশ; তারা অবকাশের প্রতিটি মিনিট যাপন করেন তাদের পর্দায়িত বিশ্রাম কক্ষে, অধ্যাপকদের নেতৃত্ব ছাড়া সেখান থেকে হন না।.........ক্লাসে তারা চক্ষু নত রাখেন পুথিঁর উপর, কোন প্রশ্ন করেন না

অধ্যাপককে পাঠ্যবিষয়ে হাসির কথা থাকলেও তাদের গাম্ভীর্যে টোল পড়ে না। এমন নয় যে করিডোর বা ক্লাসের মধ্যে কোন দৃষ্টি ভ্রমর ছুটে আসে না আমাদের দিকে- কিন্তু দর্শন পেরিয়ে তারা শ্রবণে কখনোই ধার দেননা।"

লীলা নাগ(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাকাল ১৯২১-১৯২৩)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রী লীলা নাগ(১৯০০-১৯৭০)পরবর্তীতে বিপ্লবী অনিল রায়কে বিয়ে করে লীলা রায় নামে পরিচিত হন।

বিশ শতকে সেই অবরুদ্ধ সমাজ ব্যবস্থায় লীলা রায় ছিলেন মুক্ত মনের অধিকারী, সংগ্রামী, সাহসী আশ্চর্য এক মানবী। তার বৃহৎ কর্মকানণ্ড এতটাই বৈচিত্র্যময় যে এই একবিংশ শতকে আজকের দিনেও তাঁর কর্মের তুল্য শুধু নারী কেন পুরুষদের মধ্যেও ক্ষেত্রেও পাওয়া অসম্ভব। বিধাতার অপূর্ব সৃষ্টি এই রমনী- সৌন্দর্যে, মেধায়, মননে, চিন্তায়, চেতনায়, বিপ্লবে ও সমাজ সেবায় ছিলেন অনন্য। তার প্রতিভাকে বুঝি সমুদ্রের গভীরতা দিয়ে মাপা যায়। লেখালেখির পাশাপাশি নারী জাগরণ ও নারীর আত্মনির্ভরশীলতার বাণী প্রচার করার লক্ষ্যে বহুবিধ কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হন।'দীপালি সংঘ' নামে একটি নারী সংগঠন গড়ে তোলেন। তাঁর সম্পাদনায় 'জয়শ্রী' নামে পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার মাধ্যমে নারী সমাজ তাদের মনোজগত উপাদান ও চিন্তাচেতনার উন্মেষ ঘটানোর সুযোগ লাভ করে।

অনন্য বিপ্লবী সাধক লীলা নাগের জন্ম ২১ অক্টোবর ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে লীলানাগ ইডেন স্কুল ও বেথুন কলেজ থেকে বিএ পাশ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মহিলা শিক্ষার্থী হিসেবে ১৯২১ সালে ইংরেজি বিভাগে এম.এ ক্লাসে ভর্তি হন।

সুষমা সেন গুপ্তা (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাকাল: ১৯২১-১৯২২)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর দুজন ভর্তিকৃত ছাত্রীর মধ্যে সুষমা সেন গুপ্ত অর্থনীতিতে অনার্স নিয়ে ভর্তি হন। তিনি ছিলেন জগন্নাথ হলের প্রভোস্ট ও আইন অনুষদের ডীন অধ্যাপক নরেশচন্দ্র গুপ্তের মেয়ে। আই. এ পাশ করার পর তাঁর বিয়ে হয়ে যায়। বি.এ. পাশ করার পর তাঁর দ্বিতীয় কন্যার জন্ম হয় এবং তখনকার মতো পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যায়।

ফজিলতুন নেছা (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাকাল:১৯২৫-১৯২৮)

ফজিলতুন নেছা বিধাতার বরমাল্য নিয়ে জন্মেছিলেন বলা যায়। ১৯০৫ সালে যে শিশুটি টাঙ্গাইলে জন্মেছিল, সে শিশুটি অনেক বিষয়ে প্রথম থেকে দেশকে, সমাজকে, নারী সমাজকে গৌরবান্বিত করেছিল। ১৯২৫ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত শাস্ত্রে এম.এ. অধ্যয়ন কল্পে ভর্তি হন। মুসলিম ছাত্রীদের মধ্যে তিনি ছিলেন প্রথম শিক্ষার্থী। অবিভক্ত বাংলায় তিনিই প্রথম মুসলিম নারী, যিনি উচ্চ শিক্ষার্থে সরকারি বৃত্তি নিয়ে বিদেশে অধ্যয়ন করেন। আখতার ইমাম তাঁর একটি প্রবন্ধে বলেছেন-“ বাংলাদেশের নারীরা উচ্চ শিক্ষার্থে ফজিলতুন নেসা অগ্রদূত বলে অভিহিত হওয়ার যোগ্য।”

করূণা সেন গুপ্ত(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মহিলা শিক্ষক; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে :১৯২৩-১৯৩৩)

অসাধারণ মেধার অধিকারী করণা সেন গুপ্তা(১৯২৯-১৯৭৯) বরিশালে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা উপেন্দ্রনাথ গুপ্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর দর্শনের প্রভাষক ছিলেন। করুণা সেনের ম্যাট্রিক ও আই. এ. পরীক্ষার রেজাল্ট ছিল প্রথম শ্রেণীতে প্রথম। ১৯২৯ সালে তিনি ইতিহাস বিভাগে স্নাতক সম্মান শ্রেণীতে ভর্তি হন। ১৯৩৫ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় গ্রেডের প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন।

চারুপমা বসু (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে :১৯২৯-১৯৩১)

ইংরেজি বিভাগের প্রথম শিক্ষিকা চারুপমা বসু। তিনি ইডেন স্কুল ও কলেজ থেকে যথাক্রমে ১৯২৫ ও ১৯২৭ সালে ম্যাটিক আইএ পাস করেন। তিনি আই এ পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ড থেকে প্রথম স্থান অধিকার করেন। এরপর বেথুন কলেজ থেকে ইংরেজি সাহিত্যে অর্নাস পাশ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ. ভর্তি হন। ১৯৩৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর ছাত্রী সমিতির সভানেত্রী হিসেবেও তিনি কাজ করেন।

খোদেজা খাতুন (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় :১৯৩৫-৩৯)

ফজিলতুন নেসার দশ বছর পরে প্রথম মুসলিম ছাত্রী। বগুড়া জেলার মন্ডলধরন গ্রামে তার জন্ম। বগুড়া জেলার মেয়েদের মধ্যে তিনি প্রথম এম.এ পাশ করেন। তিনি ইডেন কলেজ থেকে আই.এ পাশ করেন । ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় বি.এ. অর্নাস ক্লাসে ভর্তি হন।

আজিজুন নেসা (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় -১৯৩৭-৪১)

কিশোরগঞ্জ জেলা সদরের মধ্যবিত্ত সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৯২০ সালে আজিজুননেসার জন্ম। ইডেন কলেজ থেকে আই.এ পাস করে ১৯৩৭ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি এ. ক্লাসে ভর্তি হন।

আনোয়ারা খাতুন(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : ১৯৪০-৪২)

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার পৈরতলা গ্রামে ১৯১৭ সালে আনোয়ারা খাতুনের জন্ম। তার পিতার নাম আব্দুর রহিম, তিনি একজন প্রকৌশলী ছিলেন। ১৯৩৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ পাস করেন। ১৯৪০-৪১ শিক্ষাবর্ষে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এম.এ প্রথম পর্বে ভতি হন। ১৯৪২ সালে এম.এ পাস করেন।

নিলীমা ইব্রাহিম(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫৫-৭৯)

১৯২১ সালে নিলীমা ইব্রাহিম বাগেরহাট জেলার মূলঘর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫৮ সালে নাটক সর্ম্পকে গবেষণা করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে প্রথম মহিলা হিসেবে পি. এইচ. ডি. ডিগ্রি লাভ করেন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর প্রথম শিক্ষার্থী লীলা রায় আর বর্তমানে কনিষ্টতম শিক্ষার্থীর জীবন প্রবাহ এক নয়। তাদেরপরিবেশ পরিস্থিতি, সুযোগ-সুবিধা,প্রাপ্তি- অপ্রাপ্তির মাঝে রয়েছে বহু ভিন্নতা ও বিস্তর পার্থক্য। কালের স্রোতধারায় প্রবাহিত তাদের এ চাহিদা ও প্রাপ্তির মাঝে ঘটে যাওয়া পরিবর্তনসমূহ নারীর ক্ষমতায়নে সহায়ক হয়েছে। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষমতা ও উন্নয়ন দেশের সার্বিক অবস্থা নারী প্রগতির চিত্র ফুটে উঠেছে। এ সাফল্য, উত্তরণ ও উন্নয়ন দেশের জন্য অত্যন্ত গৌরবজনক।

৬.৩.ভাষা আন্দোলন ও ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে নারীদের অংশগ্রহণ

ভাষা আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণ

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সঙ্গে ছাত্রীদের অংশগ্রহণ ছিল অভাবিত। সে যুগে সামাজিক মুল্যবোধের পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সম্পর্ক খুব নাজুক ছিল। কিন্তু ভাষা আন্দোলনে তাদের মধ্যেকার সে দুরত্ব বাধা হয় নি। ভাষা আন্দোলনে যেসব ছাত্রী স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন তাদের মধ্যে ড.হালিমা খাতুন, সুফিয়া আহমেদ, ড. সাফিয়া খাতুন, এডভোকেট কামরুন নাহার লাইলী ও রওশন আরা বাচ্চুর নাম সর্বাধিক প্রচারিত। পরোক্ষভাবে আরো অনেক ছাত্রী সম্পৃক্ত ছিল যাদের নাম হয়ত উঠে আসেনি। ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটকে দুভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমত ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন ও ছাত্রীদের শাহাদাত বরণ। দ্বিতীয়ত ১৯৫৫-৫৬ সালের ছাত্রীদের সংগ্রাম ও কারাবরণ। ভাষা আন্দোলনের দ্বিতীয় ধাপটি

খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু কেন জানি ছাত্রীদের এ কারাবরণে অসীম সাহসিকতার কথা এ যুগে জনসমক্ষে খুব প্রচারিত নয়। সে ছাত্রীরা স্বেচ্ছায় পুলিশের হাতে ধরা দিয়ে প্রতিবাদী হয়ে কারাবরণ করে। প্রায় সব ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমতা, সাহসিকতা ও দেশপ্রেম যে আন্দোলনকে কতটা বেগবান, অপ্রতিরুদ্ধ ও সফল করেছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

১৯৫২ সালের আন্দোলনে নারীরা

ড. হালিমা খাতুন (১৯৩৩)

ভাষা কন্যা হালিমা খাতুনের জন্ম বাগেরহাট, তার বাবার নাম মৌলভী শেখ আব্দুর রহিম, মায়ের নাম দৌলুতননেসা। ১৯৫২ সালে তিনি এম.এ ক্লাসের ছাত্রী।

ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিকথায় হালিমা খাতুনের বর্ণনায় রয়েছেঃ ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলাবাজার স্কুল ও মুসলিম স্কুল থেকে বেশ কিছু ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় তিনি অবস্থান নেন। সিদ্ধান্ত হলো চার জন- চারজন করে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করতে হবে। তাদের চার জনের দলে ছিল- জুলেখা, নূরী ও সুফিয়া করিম। এই দলটি পুলিশের ব্যারিকেট ঠেলে এগিয়ে যায়। কিছুদূর যেতেই পুলিশের টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ শুরু হলে রাস্তায় তাকানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। তখন ছাত্র-ছাত্রীরা মেডিকেল কলেজের ভেতরে আশ্রয় নেয়। এইসময় পুলিশের এলোপাথারি গুলিতে অসংখ্য ছাত্র জনতা আহত ও বেশ কিছু তরুণ শহীদ হন। শহীদের মাথায় মগজ ও শরীরের টুকরা পথে ছড়িয়ে পড়ে। সারাদিন ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলে বাইরে কি হচ্ছে তা জানবার জন্য আতঙ্কিত ভাবে তারা অপেক্ষা করছিলেন। সন্ধ্যার দিকে গোলাগুলি থামলে হোস্টেলে যখন ফিরছিলেন তখন রাস্তায় ছেলেদের লাশ পড়ে থাকতে দেখেন। তার উদ্ধৃতিতে:

“ আজ যেখানে শহীদ মিনার সেখানে রক্ত আর রক্ত। ওখানে বরকত সালামের চূর্ণ হয়ে যাওয়া মাথার খুলি ও বকুল ফুলের স্তুপের মতো মগজ পড়ে আছে। আজ যেখানে শহীদ মিনার দাঁড়িয়ে

সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে ভাষা বাঁচাবার দুঃসাহসী অভিযানের কথা দৃপ্ত উচ্চারণে ঘোষণা করছে। এই শহীদ মিনার আমার কাছে এক অন্য রকম বকুল তলা।"

দীর্ঘকাল ঢাকাবিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা গবেষণা ইনিস্টিটিউটের অধ্যাপনা করে ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বরে অবসর গ্রহণ করেন।

ড. সুফিয়া আহমেদ (১৯৩২)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক এবং বর্তমানে জাতীয় অধ্যাপক ড. সুফিয়া আহমেদ ভাষা আন্দোলনে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারী ছিলেন। তিনি ১৯৫০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন।

১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারী পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদের সদস্য আনোয়ারা খাতুন মহিলাদের উপর অত্যাচারের বর্ণনা করেন। সন্ধ্যার পর সুফিয়া আহমেদ আতঙ্কিত, উৎকণ্ঠিত আত্মীয় স্বজনদের মাঝে ফিরেন। এরপর আন্দোলন চালিয়ে নেয়ার জন্য বিভিন্ন এলাকায় বাড়ি বাড়ি ঘুরে অর্থ সংগ্রহ করেন।

সুফিয়া খান (১৯২৮-)

বাহান্নর ভাষা আন্দোলনে ছাত্রদের সহযোদ্ধা ছাত্রীদের আরেকজন হলেন সুফিয়া খান। তিনি ১৯৪৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে ভর্তি হন। তখন ছাত্রীরা রাজনীতিতে সম্পৃক্ত ছিল না। তার মধ্যে সুফিয়া খান নাদের চৌধুরী মিটিং-মিছিলে অংশগ্রহণ করতেন। তারা স্কুল-কলেজের ছাত্রীদের সচেতন করে আন্দোলনে সম্পৃক্ত করতে কার্যক্রম চালাতেন। কাজটি ছিল খুব কঠিন। স্কুল

ও কলেজ কর্তৃপক্ষ এসব আন্দোলন কারী উদ্যোক্তাদের ভয়ের চোখে দেখতেন এবং তাদের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন।

রওশন আরা বাচ্চু (১৯৩২-)

রওশন আরা বাচ্চুর জন্ম ১৯৩২ সালের ১৭ই ডিসেম্বর। বাবার নাম এম.এ আশ্রাফ আলী, মা মনিরুন নেছা। তিনি কুলাউড়া শহরের উছলা পাড়ার সন্তান। ১৯৪৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি রওশন আরা বাচ্চু ছাত্রী জমায়েতে তার দায়িত্ব পালন করেন। সে জমায়েতে ছাত্র সংসদ পরিষদের আহবায়ক গাজীউল হক, আব্দুল মতিন, এস.এ.বারী, এ.টি., জুলমত আলী এবং অন্যান্যরা বক্তৃতা করেন। সাধারণ ছাত্র সভায় তুমুল বিক্ষোভের মধ্যে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের তর্ক-বিতর্ক চলে। শেষ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৪ জন করে ছাত্র-ছাত্রীর দল ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিলে যোগ দেবে বলে স্থির হল। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রওশন আরা বাচ্চু ৩য় দলের সঙ্গে ১৪৪ ধারা ভেঙ্গে মিছিলে যোগ দেন। পুলিশের লাঠিচার্জ, কাদুনে গ্যাসে আহত হয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে তারা যার যার মত আত্মরক্ষা করতে থাকে। রওশন আরা বাচ্চুও মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের কাঁটাতারের বেড়া ডিঙ্গিয়ে ভেতরে ঢুকে আত্মরক্ষা করেন। গোলাগুলি চলছিল ; আতঙ্কিত ও আঘাতপ্রাপ্ত তারা দিশেহারা হয়ে বসে থাকেন। বাচ্চুর আঘাতজনিত কাহিল অবস্থায় তার বন্ধুরা এসএম হলের প্রভোস্টের বাসা থেকে পানি নিয়ে এসে তাকে পান করায়। রাস্তায় গুলি খাওয়া ছাত্রদের খবর শুনতে পেয়ে তারা আরও ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। এ সময় তারা দেখে মুনির চৌধুরী রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন। তখন সাহস করে তার সাথে হোস্টেলে ফিরে আসে।

সেই ১৯৫২ সালের অবরুদ্ধ সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার মাঝে অসম সাহসী ও সচেতন তরুণীদের সম্পৃক্ততা ভাষা আন্দোলন সফলতার মূলে যে কতটা প্রভাবক ছিল তা সহজেই অনুমেয়। তাই জাতির জীবনে রওশন আরা বাচ্চুও অন্য ভাষা কন্যাদের অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

১৯৫৫-১৯৫৬ সালে ভাষা আন্দোলনের ক্রমধারা:

(আন্দোলনের দ্বিতীয় ধাপ)

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন নানা প্রতিবাদে, প্রতিরোধে বিকশিত হতে থাকে। কবিতায়, সঙ্গীতে, নানা প্রকার লেখনীতে ভাষার এই আবশ্যিক প্রয়োজনীয়তা গণমানুষের মর্মমূলে পৌঁছে যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা হলো মশালের আগুনের মতো; সবার প্রাণে ছড়িয়ে যায়। তাই কালের যাত্রাধ্বনি হয় প্রবাহমান ও বেগবান। সেভাবে ১৯৫৫ সালের এই দ্বিতীয় ধাপটি অত্যন্ত শক্তিময়তার পরিচায়ক ছিল।

কামরুন নাহার লাইলী (১৯৩৫-১৯৮৪)

মাতৃভাষা আন্দোলন ও নারী প্রগতির ধ্বজাবাহী প্রয়াত এডভোকেট কামরুন নাহার লাইলীর জীবন ছিল অত্যন্ত সংগ্রাম মুখর। ছাত্রী জীবন থেকে কর্মজীবন পর্যন্ত তার রাজনৈতিক সচেতনতা মানবতাবোধ বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে একটি বিশাল প্রাপ্তি। ১৯৩৫ সালের ২১ জুন পিরোজপুরের কৃষ্ণনগরে তার জন্ম। তিনি বাংলাদেশের অন্যতম নোটারী পাবলিক ছিলেন। ১৯৬০ সালে তিনি তৎকালীন ছাত্রনেতা আনোয়ার জাহিদকে জেল গেটে বিয়ে করে বেশ সাড়া জাগিয়েছিলেন। তিনি মাওলানা ভাসানীর চীনপন্থী রাজনৈতিক ভাবাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন এবং দীর্ঘকাল বাংলাদেশ চীনমৈত্রী সমিতিরি প্রেসিডেন্ট ছিলেন। লেখালেখির সঙ্গে সংযুক্ত থাকার ফলে ষাটের দশকে ইত্তোফাকের 'মহিলা পাতা' সম্পাদনা করতেন কামরুন নাহার লাইলী।

প্রতিভা মুৎসুদ্দি

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় প্রতিভা মুৎসুদ্দি ছিলেন চট্টগ্রাম কলেজের ছাত্রী। সে সময় চট্টগ্রাম কলেজের ছাত্রীদের সংঘবদ্ধ করেন। ১৯৫৫ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতিতে

স্নাতক ক্লাসে দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হন। ১৯৫৫ সালে তিনি যখন সাবসিডিয়ারি পরীক্ষার্থী তখন ২১ শে ফেব্রুয়ারী প্রস্তুতি মিটিং চলছিল। কথা ছিল সাবসিডিয়ারি পরীক্ষার্থীরা ক্লাসে যাবে না। কিন্তু তখন খবর আসলো বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করে ছাত্রদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, তখন পরীক্ষার্থী ছাত্রীরা মিছিল করে আমতলার সভায় যোগ দিতে আসে। দু সারি মিলিটারী পুলিশের মাঝখান দিয়ে তারা সভাস্থলে পৌঁছেন। একজন বক্তার বক্তৃতার মাঝে লাঠিচার্জ শুরু হয়। তখন যে দিকে পারে ছুটে গেল। প্রতিভা মুৎসুদ্দি তখন কামরুন নাহার লাইলী, ফরিদা বারি মালিক, হোসনে আরা, লায়লা নূর আরো কয়েকজন সহ বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীতে ঢুকে পড়েন। সন্ধ্যা পর্যন্ত তারা সেখানে অবস্থান করার পর সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তারা পুলিশের কাছে দলগতভাবে আত্মসমর্পণ করবেন। তারা বিশ্ববিদ্যালয় গেটে এসে পুলিশের নির্দেশমত পুলিশ ভ্যানে উঠেন। আরো অনেক ছাত্র-ছাত্রীর সাথে তাদের লালবাগ থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। প্রত্যেকের নামে আলাদা আলাদা ওয়ারেন্ট লেখা হয়।

ফরিদা বারি মালিক

তার জন্ম শান্তি নিকেতনে। ঢাকাবিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম.এ ক্লাসে ভর্তি হন। ১৯৫৫ সালের ভাষা আন্দোলনের কর্মী হিসেবে বিশেষভাবে পরিচিত। তার বন্ধুদের সাথে কাধেঁ কাঁধ মিলিয়ে রাজপথে মিছিল করেন।

দীর্ঘ দু বছর নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে ভাষা আন্দোলন জোরদার হয়। অবশেষে ১৯৫৪ সালে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট জয়লাভ করে ৯ মে অনুষ্ঠিত গণপরিষদ অধিবেশনে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। প্রথম দিকে দিনটি শহীদ দিবস হিসেবে পালিত হত। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর দিবসটি জাতীয় শোক দিবস হিসেবেও ঘোষিত হয়। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারীতে যে চেতনায় উদ্দীপিত হয়ে বাঙ্গালীরা রক্ত দিয়ে মাতৃভাষাকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তা আজ দেশের গন্ডি পেরিয়ে আর্ন্তজাতিক

সম্প্রদায়ের স্বীকৃতি লাভ করেছে। দিনটি এখন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হয়। শহীদদের এ আত্মদান একদিকে যেমন বেদনা-বিধুর অপরদিকে তেমনি গৌরবেরও বটে।

৬.৪.উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান

ভাষা আন্দোলনের পরবর্তী সব ছাত্র আন্দোলনের সাথে নারীর সম্পৃক্ততা অব্যাহত ছিল। তবে ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নারীদের অংশগ্রহণ বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে নারীদের সার্বিক চেতনা ও ক্ষমতায়নের এই ক্রমবিকাশ লক্ষণীয়।

ঊনসত্তরের গণআন্দোলনের পটভূমি রচিত হয় ষাটের দশকের শুরুতে। নানা ঘটনা প্রবাহে এগিয়ে যেতে থাকে স্বায়ত্বশাসন স্বাধিকার আন্দোলন। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে ছাত্র সমাজের নেতৃত্ব পাকিস্তান ও বর্হিবিশ্বকে চমকে দিয়েছিল। ছাত্রদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ছাত্রীরাও অসম সাহসিকতায় এ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল। তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের জন্য শুধু রোকেয়া হলই ছিল। সে সময় রোকেয়া হলের ছাত্রী সংসদের ভি.পি.ও জি এস যথাক্রমে আয়শা খানম ও রাশেদা খানম। হলের ছাত্র রাজনীতিতে ছাত্র ইউনিয়ন(মতিয়া গ্রুপ) ও ছাত্রলীগের প্রাধান্য ছিল। অবশ্য ছাত্র ইউনিয়নের (মেনন গ্রুপের) সমর্থিত ছাত্রীদের এ সংগ্রামে অংশীদারিত্ব ছিল।

৬.৫.পাকিস্তান আমলে ও স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নারী-নেত্রীদের সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড

১৯৪৭ সালের ১৪ ই আগষ্ট ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি নতুন রাষ্ট্র গঠিত হয়। পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সে ধর্ম ভিত্তিক রাষ্ট্রের প্রভাব প্রতিফলনের চেষ্টা চলে। অধিকাংশ হিন্দু

অধ্যাপক ভারতে চলে যান। ছাত্র-ছাত্রীরাও বাধ্য হয়ে বা স্বেচ্ছায় দেশ ত্যাগ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস ও অন্যান্য কার্যক্রম পরিবর্তন করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। সে দেশ ভাঙ্গা গড়ার সময়ে দেশের ক্রান্তি লগ্নে নব চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের মানসিক অবস্থা ও শিক্ষাজীবন কিভাবে সঞ্চালিত হয়েছিল তার একটি চিত্র তুলে ধরছি।

বিভিন্ন সূত্র মতে সে সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী সংখ্যা ৬০-৭০এর বেশি ছিল না। ছাত্রীদের রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ কঠিন ছিল। ছাত্রীরা যারা হোস্টেলে থাকতো তাদেরই রাজনীতি করার সুযোগ ছিল। তখনকার রক্ষণশীল সমাজে সহশিক্ষা মেনে নেয়া কঠিন ছিল। ছাত্রীদের সামাজিক ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রণীত কিছু নিয়মনীতি মেনে চলতে হতো। ক্লাসে শিক্ষকের সাথে যাওয়া-আসা করা, নির্দিষ্ট সামনের বসা ও প্রক্টরের অনুমতি নিয়ে সহপাঠি ছাত্রের সঙ্গে প্রয়োজন বোধে কথা বলা।

<u>নাদেরা চৌধুরী (১৯২৯-)- পাকিস্তান আমল</u>

নাদেরা চৌধুরী প্রথম মুসলিম মহিলা যিনি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃত্ব দানের জন্য কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। তার তিন বছরের কারাদন্ড হয়েছিল। ১৯৪৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে অনার্স শেষ করে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজিতে এম.এ. প্রথম পর্বে ভর্তি হন। ছাত্রী হিসেবে তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। স্কুল ও কলেজে বরাবর কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

তিনি সরকার বিরোধী আন্দোলনে যোগ দেন। তখন মেয়েদের সচেতন করার জন্য ‘ছাত্রী সংঘ’ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং নাদেরা চৌধুরীকে এই সংগঠন গড়ার দায়িত্ব দেয়া হয়। নাদেরা চৌধুরী সে সময়ের আন্দোলনের গতি সর্ম্পর্কে বলেছেন- “আটচল্লিশ উনচল্লিশের আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি ছিল অনেকটা দৈনন্দিন সমস্যা ভিত্তিক, কিছুটা বামপন্থী। ছাত্রী সংঘের কাজ ছিল ও ছাত্রীজীবনের সমস্যা নিয়ে।” তাদের কর্মক্ষেত্র ছিল মেয়েদের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান-ইডেন কলেজ, কামরুন নেসা স্কুল,

মুসলীম গার্লস স্কুল প্রভৃতি। সরকারের শিক্ষাসংকোচন নীতির বিপক্ষে এবং শিক্ষা সম্প্রসারণের পক্ষে এই সংগঠন কাজ করতো।

১৯৪৯ সালের প্রথম দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা তাদের বেতন বৃদ্ধি, চিকিৎসা ভাতা, পেনসন ইত্যাদি দাবির পরিপ্রেক্ষিতে হরতাল করেন। তখন ছাত্র ফেডারেশন, ছাত্রী সংঘ এবং পরে আরো বলতে গেলে পূর্ব পাকিস্থানের গোটা ছাত্রসমাজ এ হরতাল সমর্থন করেন এবং অনেকে এতে যোগদান করেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সরকারের নির্দেশে অনেক ছাত্র-ছাত্রীকে বহিষ্কার করে। এদের মধ্যে যে দুজন ছাত্রী ছিলেন তারা হলেন- লুলু বিলকিস বাণু ও নাদেরা চৌধুরী।

জাহানারা আখতার (ইসলাম)

১৯৬০-৬১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় সংসদের (ডাকসু) প্রথম মহিলা ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিন হন। ষাটের দশকে আইয়ুব-মোনেম শাসনকাল। দেশব্যাপী সামরিক শাসন, সুতরাং ডাকসুর ভি.পি. হিসেবে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে গৃহিত সকল আন্দোলন ও কর্মসূচীতে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন। তখনকার বিখ্যাত আমতলায় সভা-সমাবেশ ও রাস্তায় মিছিল করেছেন। সে সময়কার সমাবর্তন অনুষ্ঠানে আবদুল মোনেম খানের হাত থেকে ছাত্র সমাজ সার্টিফিকেট গ্রহণ করতে অসম্মতি জানায়। সেই আন্দোলনে ডাকসুর অগ্রণী ভূমিকা ছিল।

জাহানারা আক্তার ১৯৫৫ সালে কামরুননেসা বালিকা বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক. ১৯৫৭ সালে ইডেন গার্লস কলেজ থেকে ইডেন গার্লস কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৮-১৯৬১ সালে সমাজবিজ্ঞানে সম্মান এম.এ. ডিগ্রি লাভ করেন।

মতিয়া চৌধুরী

২০১১ সালের গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরীর রাজনৈতিক জীবন বহুসংগ্রাম, ত্যাগ ও একনিষ্ঠ দেশপ্রেমের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তরণের ফল। ১৯৪২ সালে তার জন্ম। তার মাতার নাম নূরজাহান বেগম, পিতা হলেন পুলিশ অফিসার মহিউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী। ১৯৫২ সালে স্কুলের ছাত্রী মতিয়া চৌধুরী ভাষা শহীদদের উদ্দেশ্যে প্রথম বক্তৃতা করেন। তারপর ইডেন কলেজে ছাত্ররাজনীতি শুরু হয়।

প্রতিভা মুৎসুদ্দি

প্রতিভা মুৎসুদ্দি চট্টগ্রামের রাউজানে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের জন্য পৃথক হল স্থাপিত হয়। প্রথম হল সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতি চলতে থাকে। প্রতিভা মুৎসুদ্দি প্রথম ছাত্রী সংসদের ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হন।

নাজমা আহমেদ (১৯৫২-৫৬)

নাজমা আহমেদ ১৯৫২-৫৬ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগ ও তখনকার উইমেন্স হলের অনাবাসিক ছাত্রী ছিলেন। পড়াশুনা ছাড়াও নাজমা আহমদ তখনকার ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে জড়িত ছিলেন। সাংস্কৃতিক সংসদ ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে তিনি উইমেন্স হল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক. ক্রীড়ানুষ্ঠান, সমাজসেবামূলক এবং রাজনৈতিক কর্মকান্ডের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

মালেকা বেগম (১৯৬২-৬৮)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ডাকসুর' সদস্য এবং রোকেয়া হলে পরপর দুবার (১৯৬৭-৬৮ ও ১৯৬৮-৬৯) ভিপি নির্বাচিত হন। ছাত্র আন্দোলন, নারী আন্দোলন মুক্তিযুদ্ধে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। পারিবারিকভাবে প্রগতিশীল রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি ১৯৪৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উইমেন্স এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগে শিক্ষাকতা করেন। প্রগতিশীল ছাত্র আন্দোলনে তার অসাধারণ ভূমিকা বাংলাদেশের নারীদের জন্য এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

সালমা আখতার (১৯৬৪-১৯৬৮)

বর্তমানে শিক্ষা ও গবেষণা ইনিস্টিটিউট এর অধ্যাপক সালমা আখতার ছাত্রজীবনে তুখোড় রাজনৈতিক নেত্রী ছিলেন। সালমা আখতারের জন্ম টাঙ্গাইলে। ১৯৬৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৬৭ সালে অনার্স ও ১৯৬৮ সালে এম. এ. পাশ করেন। ছাত্রশিক্ষক সর্ম্পক উন্নয়ন ও ছাত্রীদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানকল্পে তিনি নিজকে নিয়োজিত রাখেন। শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে তার পরিচালিত কার্যক্রম অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

স্বাধীনতা যুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের অবদান

বাঙ্গালি জাতির ইতিহাসে স্বাধীনতা যুদ্ধ একটি অনন্য সাধারণ ঘটনা। এ যুদ্ধে আপামর জনসাধারণ জীবনপণ করে তাদের মাতৃভূমি স্বাধীনতা অর্জন করেছিল। এ যুদ্ধে পুরুষদের সাথে নারীদের অংশগ্রহণ ছিল অভাবিত। তাদের অংশগ্রহণ ছিল বহুমাত্রিক। একথা বলা বাহুল্য যে, ব্রিটিশ আমল এবং পাক শাসনকালে প্রতিটি ছাত্র আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী সমানভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। এছাড়া সত্তরের দশকে আধুনিক বিশ্বে আমাদের মনোজাগতিক সামাজিক ক্ষেত্রে প্রচুর উন্নতি ঘটে। সুতরাং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের সে অসীম সাহসিকতা, বীরত্ব গাথাঁ দেশের জন্য অত্যান্ত গৌরবজনক।

মুক্তিযুদ্ধের সাথে প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে যারা গুরুত্বপূর্ণ কাজে জড়িত ছিলেন তারা হলেন
১.সাজেদা চৌধুরী ২.বদরুন নেসা আহমেদ ৩.জাহানারা ইমাম ৪.আইভি রহমান ৫. মতিয়া চৌধুরী
৬. মালেকা বেগম ৭.মাহফুজা খানম ৮.আইশা খানম ৯.সুলতানা কামাল ১০. রাশেদা খানম
১১. রাফিয়া আখতার ডলি ১২.ফোরকান বেগম ১৩.ফরিদা আখতার সাকী ১৪.বেবী মওদুদ ও অনেকে

যে কোন বিষয়কে ভালভাবে জানার নিমিত্তে ঐ বিষয়ের অতীত প্রেক্ষাপট জানা প্রয়োজন। এ অধ্যায়টি গবেষক বাংলাদেশ সৃষ্টির প্রেক্ষাপটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের অবদানের বিষয়টি জানার অভিপ্রায়ে আলোকপাত করেছে।

৭ম অধ্যায়

উপাত্ত উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ

৭ম অধ্যায়

উপাত্ত উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ

'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়নরত ছাত্রীদের সামাজিক প্রেক্ষাপট অনুসন্ধান'

শীর্ষক গবেষণাটির এ পর্যায়ে গবেষক তাঁর সংগৃহিত তথ্য বিশ্লেষণের প্রয়াশ করেন। এ পর্যায়ে গবেষক তাঁর প্রাপ্ত সাধারণ তথ্য পর্যালোচনা করে এ সিদ্ধান্তে উপনিত হয় যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকালীন ও পরবর্তী পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত প্রায় প্রতিটি অনুষদের ছাত্রীদের নিকট থেকে তথ্য সংগৃহিত হয়েছে। কলা অনুষদের ৫৩ জন ছাত্রী, বিজ্ঞান অনুষদের ১৫ জন ছাত্রী, জীববিজ্ঞান অনুষদের ১৪ জন শিক্ষার্থী, চারুকলা অনুষদের ৫ জন ছাত্রী, আইন অনুষদের ১ জন ছাত্রী ও বিভিন্ন ইনস্টিটিউট এর ১২ জন ছাত্রী গবেষণাকার্যে অংশগ্রহণ করে।[৩১] গবেষক শুধু ফার্মেসী অনুষদের ছাত্রীদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহে অপারগ হয়েছে। এ অধ্যায়ে গবেষক ছাত্রীদের প্রেরিত তথ্য উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করে।

সাধারণ তথ্য

সারণী নং-১

অধ্যয়ন বর্ষ		
বর্ষ	সংখ্যা	শতকরা হার
স্নাতক(প্রথম)	১৮	৩০.৬
স্নাতক(দ্বিতীয়)	৩১	৫২.৭
স্নাতক(তৃতীয়)	৪০	৬৮
স্নাতক (চতুর্থ)	৩৩	৫৬.১
স্নাতকোত্তর	৪২	৭১.৪
এম.ফিল.	৬	১০.২
মোট	১৭০	

উপরোক্ত তালিকা থেকে বলা যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রীদের মধ্যে থেকে প্রথম,দ্বিতীয়,তৃতীয়,চতুর্থ,স্নাতকোত্তর ও এম.ফিল. পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা যথাক্রমে ১৮, ৩১, ৪০, ৩৩, ৪২ ও ৬ জন। এসব শিক্ষার্থীর মধ্যে স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ একটু বেশি। শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের সংখ্যাটিকে শতকরা হিসেবে দেখানো হয়েছে। নিম্নে শতকরা হার, সংখ্যা তালিকাটি গ্রাফে দেখানো হয়েছে।

৩১. দ্বিতীয় অধ্যায়, ২ এর গবেষণায় অনুসৃত পদ্ধতি অনুসারে,পৃষ্ঠা নং-২৭

গ্রাফ নং -১

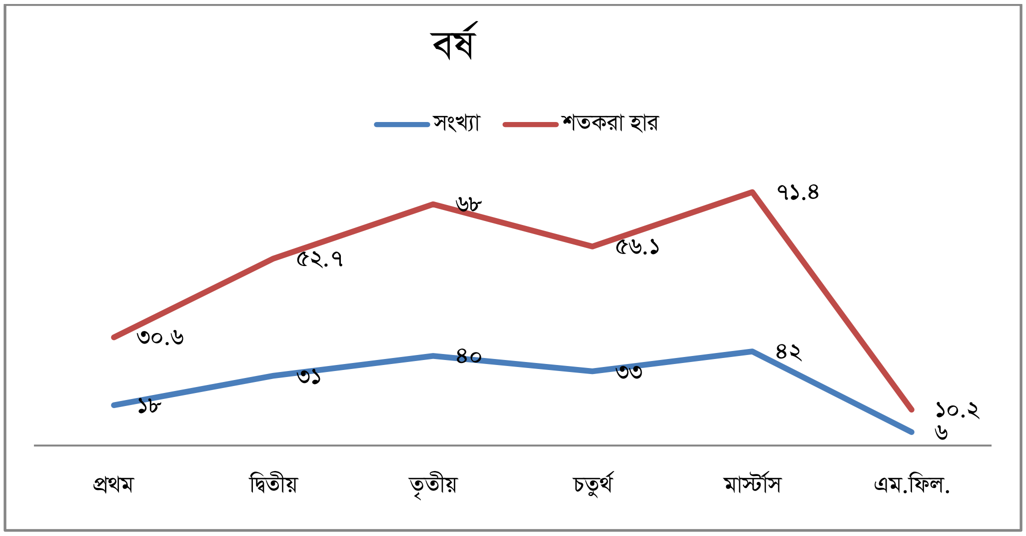

১ নং গ্রাফে অধ্যয়নরত ছাত্রীদের অধিত বর্ষের গ্রাফ দেখানো হয়েছে। এখানে ছাত্রীদের অংশগ্রহণের সংখ্যাটি নীল ও লাল লাইন দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। ছাত্রীদের অংশগ্রহণের শতকরা হারটি যথাক্রমে ৩০.৬%, ৫৭.৭%, ৬৮%, ৫৬.১%, ৭১.৪%, ১০.২%।

সারণী নং-২

বসবাস		
ধরন	সংখ্যা	শতকরা হার
আবাসিক	১৪৬	৮৫.৯
অনাবাসিক	২৪	১৪.১
মোট	১৭০	

উপরোক্ত ছকে অংশগ্রহণকৃত ছাত্রীদের মধ্যে ১৪৬ জন বিভিন্ন আবাসিক হলের নিয়মিত ছাত্রী আর ২৪ জন হলের অনিয়মিত ছাত্রী। যা শতকরায় প্রকাশ করলে হয়,৮৫.৯%, ১৪.১% জন। অর্থাৎ এই গবেষণার মাধ্যমে বলা যায় যে,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রীদের দুই তৃতীয়াংশ আবাসিক হলে অবস্থান করে।

গ্রাফ নং ২

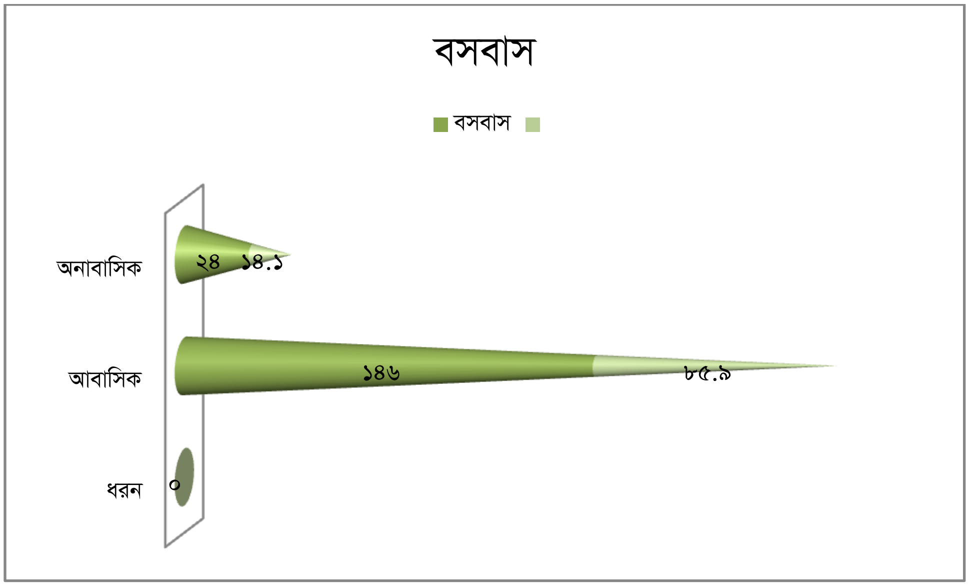

গ্রাফ থেকে দেখা যায় যে, ২৪ জন অনাবাসিক ছাত্রী তথা ১৪.১% ও ১৪৬ জন আবাসিক ছাত্রী তথা ৮৫.৯% জন গবেষণায় অংশগ্রহণ করেছে।

সারণী নং -৩

ধর্ম	সংখ্যা	শতকরা হার
মুসলমান	১৫৩	৯০
হিন্দু	১৫	৮.৮২
বৌদ্ধ	২	১.১৮
মোট	১৭০	

বাংলাদেশের অধিকাংশ জনগোষ্ঠী ইসলাম ধর্মাবলম্বী। যার প্রমাণ গবেষক ৩ নং সারণী থেকে পেয়েছে। গবেষণায় অংশগ্রহণকারী নমুনাদের মধ্যে ১৫৩ জন মুসলমান,১৫ জন হিন্দু,২ জন বৌদ্ধ।

গ্রাফ নং-৩

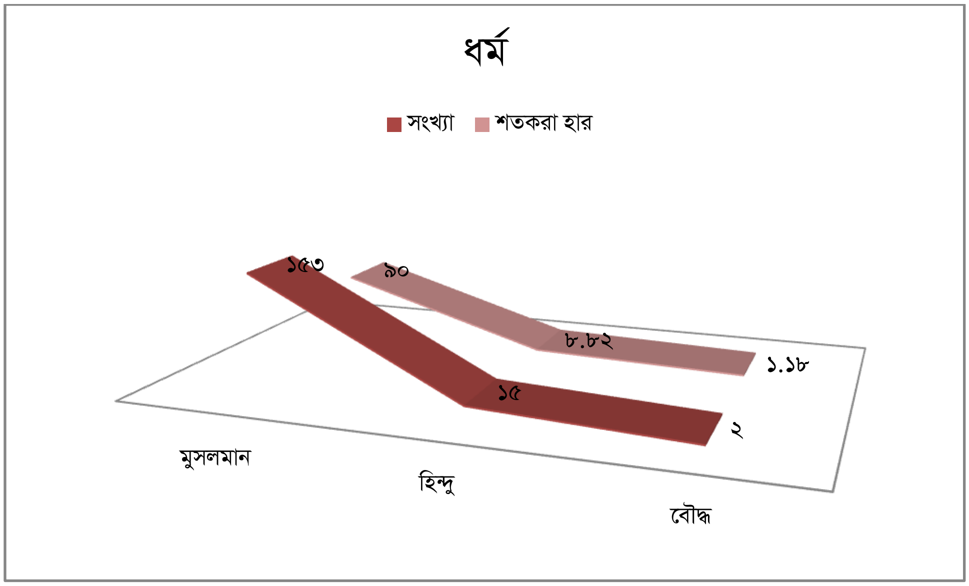

গ্রাফ থেকে দেখা যায়, ১৭০ জনের মধ্যে ৯০% মুসলমান, ৮.৮২% হিন্দু, ১.১৮% বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। অর্থাৎ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রীদের মধ্যে ৯০% ছাত্রী মুসলমান।

পারিবারিক বিষয়

সারণী নং-৪

পরিবারের সদস্য	
সদস্য	সংখ্যা
৯ জন	১
৮ জন	৫
৭ জন	১০
৬ জন	২৩
৫ জন	৪৮
৪ জন	৫২
৩ জন	২২

৫ নং সারণী থেকে দেখা যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের মধ্যে পরিবারের সদস্যসংখ্যা ৪ জন এমন পরিবারের সংখ্যা বেশি অর্থাৎ আমরা বলতে পারি একক পরিবারের প্রাধান্য গ্রাম,শহর

সবখানে রয়েছে। তবে যৌথ পরিবার তথা অতি বৃহৎ পরিবারগুলোর সংখ্যা একক পরিবারের তুলনায় কম। প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৯,৮, ৭, ৬ জন এমন পরিবারের সংখ্যা যথাক্রমে ১, ৫, ১০, ২৩ জন।

গ্রাফ নং-৪

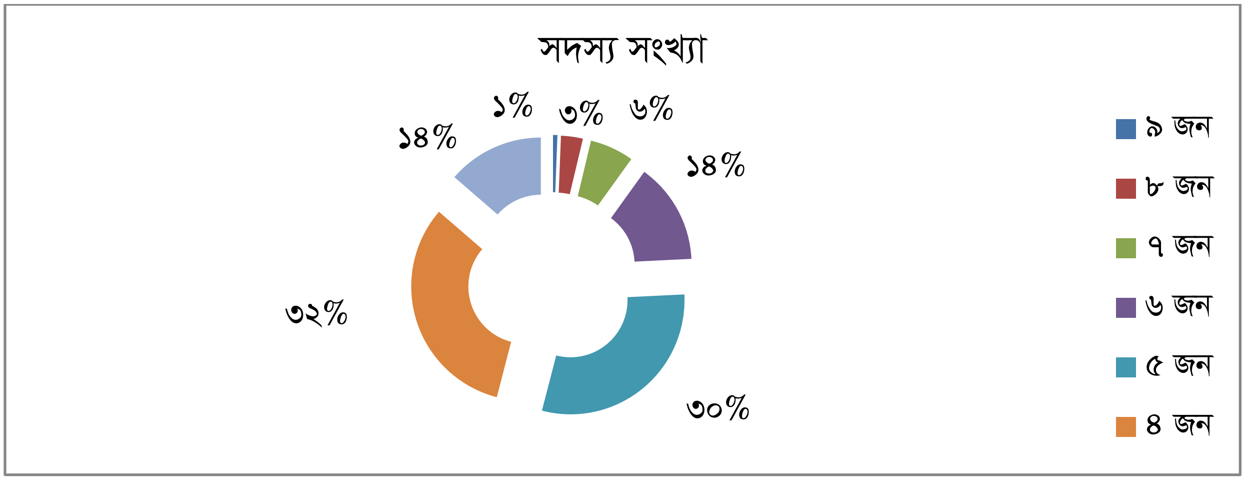

উপরের ৪ নং-ছক থেকে দেখা যায় যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের মধ্যে যাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৯ জন,ছাত্রীর সংখ্যা মাত্র ১% । একইভাবে পরিবারের সদস্যসংখ্যা ৮,৭, ৬, ৫, ৪, ৩ জন এমন অংশগ্রহনকারী যথাক্রমে ৩%, ৬%, ১৪%, ৩০% ৩২%, ১৪%

সারণী নং-৫

বাবার শিক্ষাগত যোগ্যতা		
শিক্ষাগত যোগ্যতা	সংখ্যা	শতকরা হার
স্নাতকোত্তর	৪৮	৩১.৫৮
স্নাতক	৬০	৩৯.৪৭
এস.এস.সি.	২০	১৩.১৬
এইচ.এস.সি	১৫	৯.৮৭
৫ম-৮ম	৭	৪.৬১
সাক্ষর জ্ঞান	২	১.৩২
মোট	১৫২	

 পিতার শিক্ষাগত যোগ্যতা পোস্ট ডক্টরেট এমন ছাত্রীর সংখ্যা মাত্র ১জন হওয়ায় গবেষক তা তালিকাবদ্ধ করেন নি। তবে আশার কথা এই যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের মধ্যে কারো পিতাই নিরক্ষর নন। শিক্ষার বিভিন্ন স্তর বিবেচনা করে বলা যায় যে, স্নাতক ও স্নাতকোত্তরধারী পিতার সংখ্যা ৬০ ও ৪৭ জন। পিতার শিক্ষাগত যোগ্যতা এইচ.এস.সি. ও এস.এস.সি. এমন ছাত্রীর সংখ্যা ১৫ জন ও ২০ জন। যাদের পিতা প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত এমন শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৭ জন। পিতা সাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন এমন নমুনার সংখ্যা মাত্র ২ জন। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে শিক্ষার উচ্চস্তর সম্পন্ন করেছেন এমন পিতাদের মধ্যে তাদের কন্যা সন্তানকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করার আগ্রহ বেশি।

গ্রাফ নং-৫

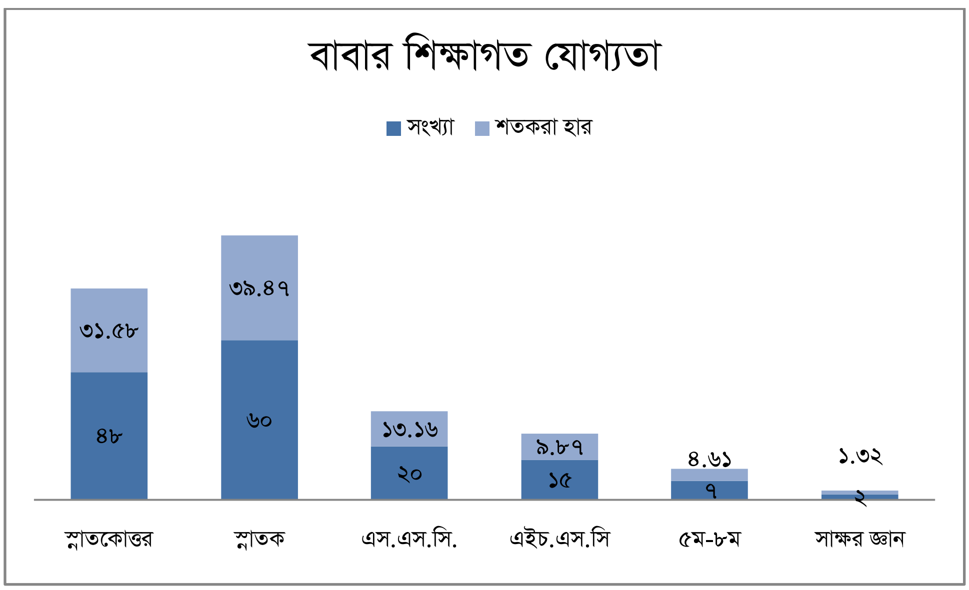

৬ নং গ্রাফ থেকে দেখা যায়, যাদের পিতা স্নাতক ও স্নাতকোত্তরধারী তাদের সংখ্যা যথাক্রমে ৩৯.৪৭%, ৩১.৫৮% ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের দুই তৃতীয়াংশের পিতা উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত। যেসব ছাত্রীর পিতার শিক্ষাগত যোগ্যতা এইচ.এস.সি. ও এস.এস.সি. তাদের সংখ্যা মোট অংশগ্রহনকারীর মধ্যে ১৩.১৬% ও ৯.৮৭%। যাদের পিতা সাক্ষনজ্ঞান সম্পন্ন এমন ছাত্রীর সংখ্যা মোট অংশগ্রহনকারীর ১.৩২%।

সারণী নং-৬

শিক্ষাগত যোগ্যতা(মা)	সংখ্যা	শতকরা হার
৫ম-৯ম	২১	১৩.১৩
এস.এস.সি.	৪৮	৩০
এইচ.এস.সি	৩০	১৮.৭৫
স্নাতক	৪৯	৩০.৬৩
এম.এ./এম.এস.	১২	৭.৫
মোট	১৬০	

গ্রাফ নং-৬

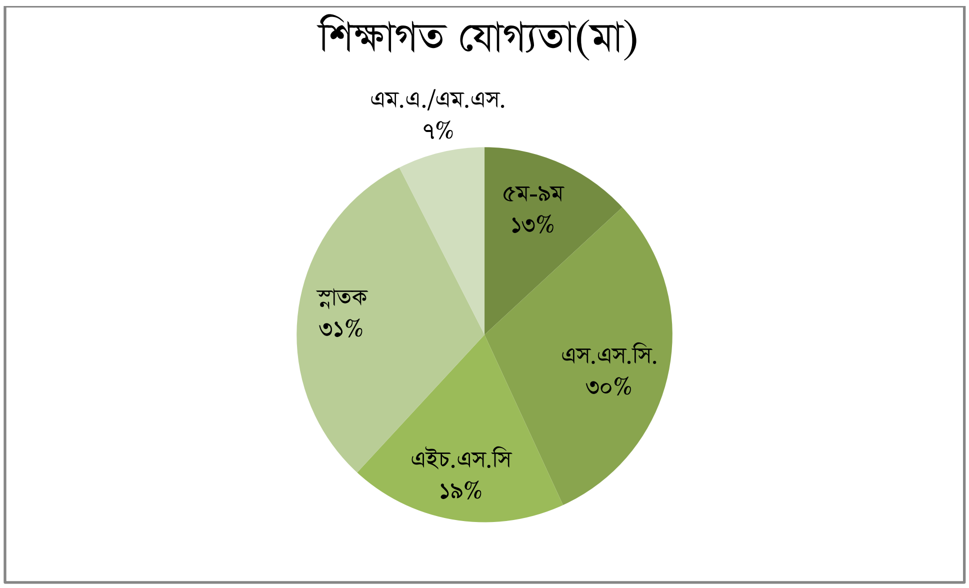

সারণী নং-৭ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রীদের মধ্যে যাদের মায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক ও স্নাতকোত্তর তাদের সংখ্যা যথাক্রমে ৪৯ ও ১২ জন। আবার যেসব নমুনাদের মায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতা এইচ.এস.সি. ও এস.এস.সি. তাদের সংখ্যা যথাক্রমে ৪৮ ও ৩০। শিক্ষার প্রাথমিক স্তর সম্পন্ন করেছে যাদের মা তাদের সংখ্যা ২১ জন। সারণী ৬ এর সাথে সারণী-৭ এর তুলনা করলে দেখা যায় যে, শিক্ষার মাধ্যমিক স্তর সম্পন্ন করেছে এমন মায়েদের তাদের মেয়েদের শিক্ষিত করার আগ্রহ বেশি। আবার এ সারণী থেকে এ কথাও বলা যায় যে, উচ্চশিক্ষায় ছেলেদের তুলনায় আমাদের দেশের মেয়েরা অনেক পিছিয়ে রয়েছে।

সারণী নং-৭

বাবার পেশা	সংখ্যা	শতকরা
ব্যবসায়ী	৪০	২৭.২
শিক্ষকতা	২২	১৫.০
ডাক্তার	২	১.৪
চাকুরী	৫২	৩৫.৪
কৃষি	১৪	৯.৫
উকিল	৪	২.৭
বেকার(অবসর)	১২	৮.২
দলিল লেখক	১	০.৭
প্রবাসী	২	১.৪
মোট	১৪৭	

৮ নং সারণী থেকে এটা বলা যায় যে, যেসব পেশায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের পিতারা নিয়োজিত আছেন, সেসব পেশাগুলো আমাদের সমাজের মর্যাদাপূর্ণ পেশা। সারণী থেকে এটা বলা যায় যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রীরা গ্রাম শহর যেখানেই অবস্থান গ্রহণ করুক না কেন,তাদের পারিবারিক অবস্থা মোটামুটি স্বচ্ছল।

গ্রাফ নং-৭

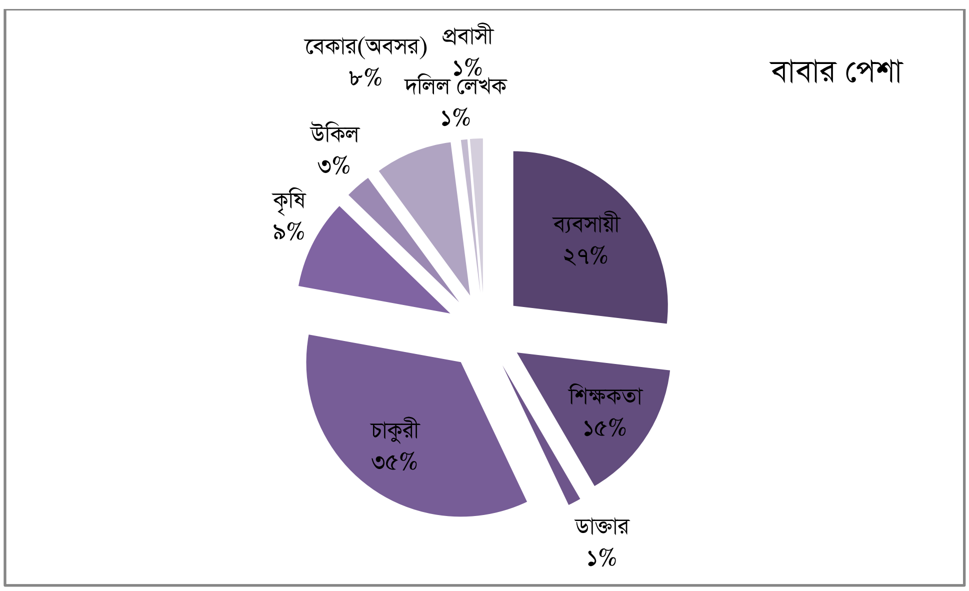

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রীদের মধ্যে ৩৫% শিক্ষার্থীর বাবা চাকুরীজীবী। ব্যবসা, শিক্ষকতা পেশার সাথে জড়িত রয়েছেন ২৭% ও ১৫% বাবা। কৃষিকাজ ও অবসরপ্রাপ্ত পেশাজীবীর সংখ্যা ৯%ও ৮% । গ্রাফ থেকে এটা বলা যায় যে, সামাজিক অবস্থান নির্ণয়ের সূচকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রীদের পরিবারের আর্থিক অবস্থা ভালো। এখানে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য হলো গবেষণায় যারা অংশগ্রহণ করেছেন, তাদের মধ্যে মাত্র ১৪৭ জন তাদের পিতার পেশা উল্লেখ করেছেন। অনেকেই পিতার পেশা উল্লেখ করেননি, আবার অনেকের পিতা বর্তমানে পৃথিবীতে নেই।

সারণী নং-৮

মায়ের পেশা		
মায়ের পেশা	সংখ্যা	শতকরা হার
গৃহিণী	১৩৫	৮৩.৮৫
চাকুরী	১৩	৮.০৭
শিক্ষকতা	১৩	৮.০৭
ব্যবসা	১	০.৬২
মোট	১৬১	

সারণী পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রীদের মায়েরা অধিকাংশই গৃহ সজ্জার সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত রেখেছেন।

গ্রাফ নং-৮

গ্রাফ থেকে বলা যায় যে,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রীদের মধ্যে শতকরা ৮৩.৮৫% শিক্ষার্থীর মা গৃহিণী। এছাড়া শিক্ষকতা ও চাকুরীর সাথে সম্পৃক্ত রয়েছেন ৮.০৭% মা। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, যেসব শিক্ষার্থী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে তাদের মধ্যে যাদের মায়েরা গৃহিণী তারাই তাদের মেয়েদের উচ্চশিক্ষার বিষয়ে আগ্রহী।

সারণী নং-৯

বাবার মাসিক আয়	সংখ্যা	শতকরা হার
৭০,০০০-১,৮০০০০	৩	২.১৪
৬০,০০০-৭০,০০০	৬	৪.২৮৬
৪০,০০০-৫০,০০০	১৮	১২.৮৬
৩০,০০০-৩৫,০০০	২৩	১৬.৪৩
১৮,০০০-২৫,০০০	৩৮	২৭.১৪
১২,০০০-১৭,০০০	২০	১৪.২৯
৭০০০-১১,০০০	২৩	১৬.৪৩
৩০০০-৮০০০	৯	৬.৪৩
মোট	১৪০	

গবেষণার সুবিধার জন্য গবেষক প্রাপ্ত তথ্য থেকে পিতার মাসিক আয়কে বিবেচনা করে ,নিম্নোক্ত শ্রেণীবিন্যাস নির্ধারণ করেছেন,

নিম্নবিত্ত (৩০০০-৮০০০)টাকা

নিম্ন মধ্যবিত্ত (১১০০০-১৭০০০)টাকা

উচ্চ মধ্যবিত্ত(১৮০০০-৫০০০০)টাকা

উচ্চবিত্ত(৭০০০০-১৮০০০০)টাকা

গ্রাফ নং-৯

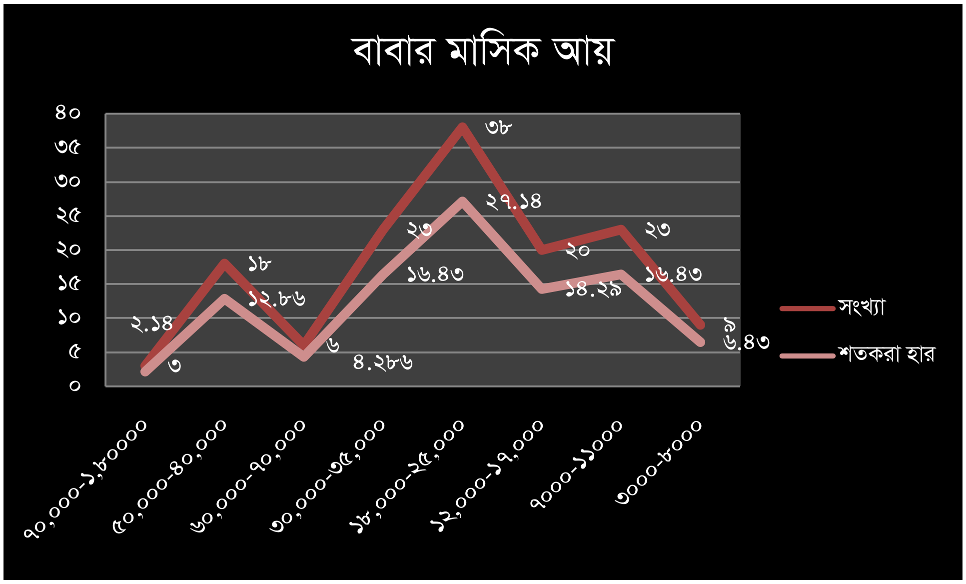

গ্রাফ পর্যালোচনা করে বলা যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রীদের মধ্যে মাত্র ৬.৪৩% নিম্নবিত্ত পরিবারে বসবাস করে,২.১৪% উচ্চবিত্ত পরিবারে বসবাস করে,নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে বসবাস করে (২৩%+২০%)৪৩% আর উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারে বসবাস বরে (৩৮%+২৩%+১৮%+৬%)=৮৫% পরিবার। সুতরাং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রীদের মধ্যে অধিকাংশই মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আগত। এর মধ্যে উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আগত ছাত্রীর সংখ্যা বেশি।

সারণী নং-১০

মায়ের মাসিক আয়	সংখ্যা
৩০০০-৫০০০	৫
১০,০০০-১২,০০০	৫
১৫,০০০-১৮,০০০	১১
৭০০০-৯০০০	৩
২০,০০০-২৫,০০০	৬
৩০,০০০-৩৫০০০	২
৩৫,০০০-৫০,০০০	১
মোট	৩৩

গ্রাফ নং-১০

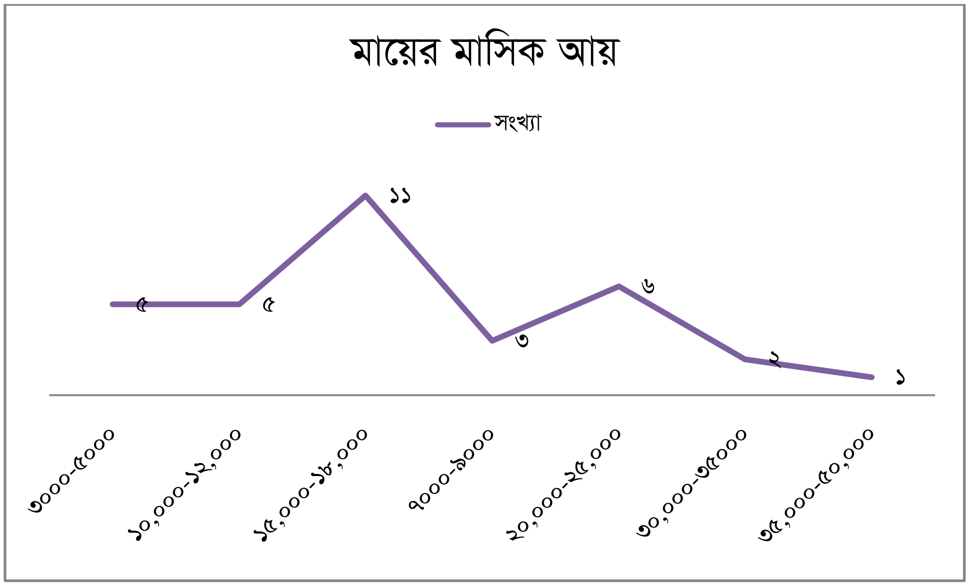

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রীদের মধ্যে প্রায় ৮৩% শিক্ষার্থীর মা গৃহিণী(সংগৃহিত সারণী-৯)। তারা গৃহিণী হওয়ার কারণে অধিকাংশ ছাত্রীর মায়ের মাসিক আয় প্রায় নেই। কিছু কিছু গৃহিণী মা বাসাভাড়া, অন্যান্য আয়ের উৎস থেকে আয় করে থাকে। যেসব মায়েরা কর্মজীবী তাদের মাসিক আয় পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, অধিকাংশ মায়ের মাসিক আয় (২৫০০০-৩০০০০) টাকা এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। ৩০০০০ এর উপরে মাসিক আয় রয়েছে মাত্র ৩ জন মায়ের।

সারণী নং-১১

আয়ের অন্যান্য উৎস

আয়ের অন্যান্য উৎস	সংখ্যা	শতকরা হার
গ্রামের সম্পদ	৭	১৮.৯১৯
বাবার পেনসন	২	৫.৪০৫
মৎস চাষ	১	২.৭০৩
দোকান/বাড়ি ভাড়া	৮	২১.৬২২
সেলাই মেশিন	১	২.৭০৩
ব্যবসা	৬	১৬.২১৬
কৃষি কাজ	৭	১৮.৯১৯
পারিবারিক সম্পত্তি	১	২.৭০৩
জমির লিজ	১	২.৭০৩
শেয়ার বাজার	২	৫.৪০৫

সেভিংস	১	২.৭০৩
মোট	৩৭	

এই সারণী থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রীদের পরিবারের আয়ের অন্যান্য উৎস পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, নিয়মিত পেশা থেকে আয়ের পাশাপাশি গ্রামের সম্পদ, বাড়িভাড়া, ব্যবসা, কৃষিকাজ প্রভৃতির মাধ্যমে অনেক পরিবারে অর্থসংস্থান হয়ে থাকে।

গ্রাফ নং-১১

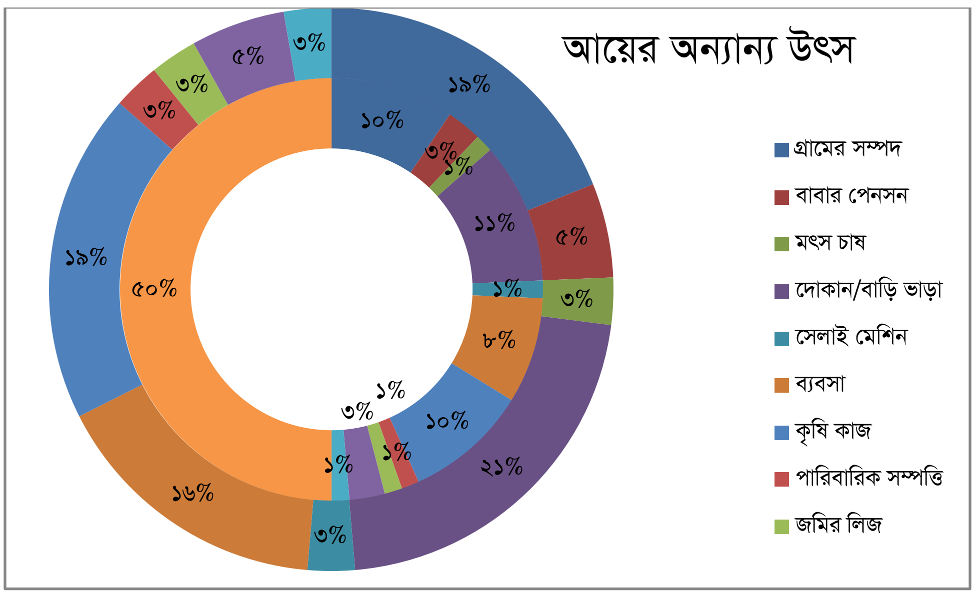

গ্রামের সম্পদ থেকে আয় করেন ১৯% ছাত্রীর পরিবার। এছাড়া বাড়িভাড়া , কৃষিকাজ করে পরিবারে স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রেখেছে প্রায় ৪০% পরিবার। ব্যবসা থেকে আয় করেন প্রায় ৫০% পরিবার।

বাসস্থান

সারণী নং-১২

বসবাসের স্থান	সংখ্যা	শতকরা হার
গ্রাম	৬০	৩৫.২৯
উপ-জেলাশহর	৩০	১৭.৬৫
জেলা শহর	৫০	২৯.৪১
বিভাগীয় শহর	১০	৫.৮৮
রাজধানী	২০	১১.৭৬
মোট	১৭০	

সারণীটি পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, অধ্যয়নরত ছাত্রীদের মধ্যে ৬০ জনের পরিবার গ্রামে, জেলা শহরে ৫০ জনের, উপজেলা শহরে ৩০ জনের ও রাজধানীতে ২০ জনের পরিবার বসবাস করে। অধ্যয়নরত ছাত্রীদের মধ্যে এক পঞ্চমাংশ গ্রামে বসবাস করে। রাজধানী ঢাকা শহরে বসবাস করছে মাত্র ১১.৭৬% শিক্ষার্থীর পরিবার।

তাই বলা যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রীদের এক পঞ্চমাংশ গ্রামে বসবাস করছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রীদের মধ্যে উপ-জেলাশহর, রাজধানী শহর, বিভাগীয় শহরে বসবাসরত ছাত্রীর সমন্বয় রয়েছে।

গ্রাফ নং-১২

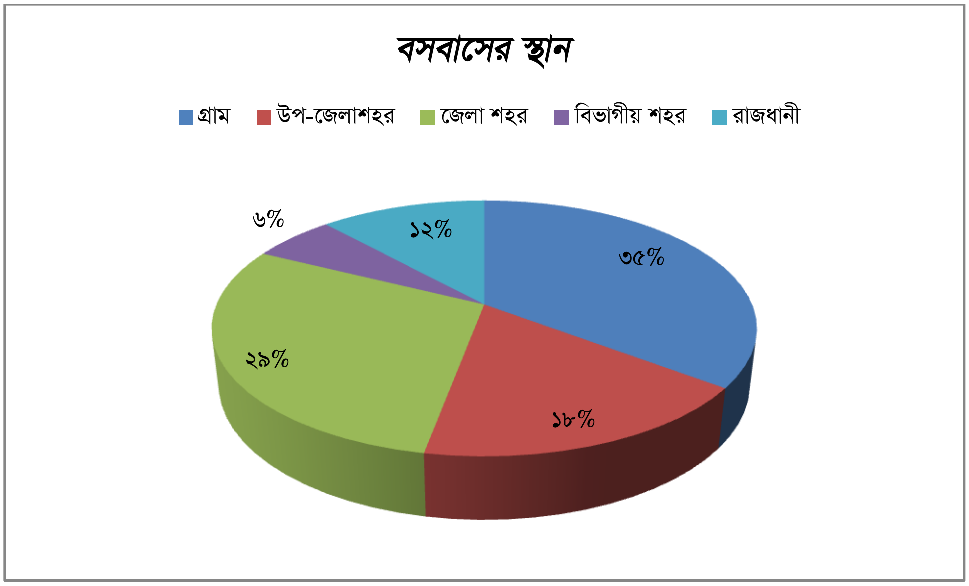

সারণী নং ১৩

বাড়ির ধরন		
বাড়ির ধরন	***শতকরা হার***	***সংখ্যা***
পাকা বাড়ি	৭০	১১৯
আধা-পাকা বাড়ি	২৪.১২	৪১
কাঁচা বাড়ি	৫.৮৮	১০
অন্যান্য	০	০
মোট		১৭০

গ্রাফ নং-১৩

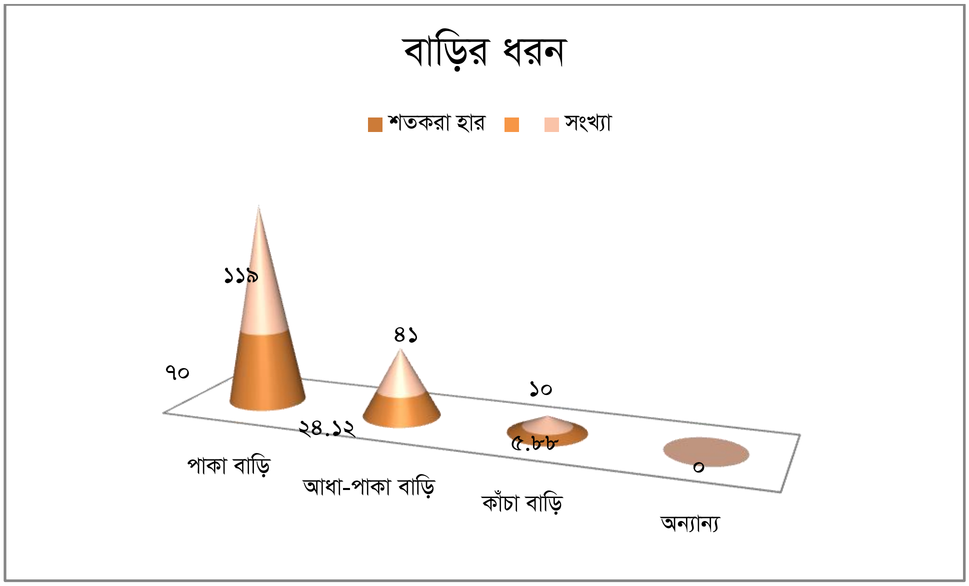

উপরোক্ত গ্রাফ থেকে বলা যায় যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রীদের বাড়ির ধরন বিবেচনায় পাকাবাড়িতে বসবাস করেন ১১৯ জন অর্থাৎ ৭০% ছাত্রীর পরিবারের সদস্যরা পাকা বাড়িতে বসবাস করেন। আধাপাকা, কাঁচা বাড়িতে বসবাস করেন ২৪.১২% ও ৫.৮৮% ছাত্রীর পরিবারের সদস্যরা। সাধারনত এটা মনে করা হয় যে, যারা পাকা বাড়িতে বসবাস করেন তাদের আর্থিক অবস্থা ও সামাজিক মর্যাদা অন্যান্যদের তুলনায় একটু বেশি। সুতরাং বলা যায় যে, যারা উচ্চশিক্ষায় অধ্যয়নরত তাদের পারিবারিক অবস্থা স্বচ্ছল।

সারণী নং-১৪

বাড়িটি কেমন	সংখ্যা	শতকরা হার
নিজস্ব বাড়ি	১৪০	৮২.৩৫
ভাড়া বাড়ি	২৬	১৫.২৯
আত্মীয়ের বাড়ি	০	০.০০
সরকারি বাড়ি	৪	২.৩৫
অন্যান্য	০	০.০০
মোট	১৭০	

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রীদের প্রায় সকলেই নিজস্ব বাড়িতে বসবাস করে। ছাত্রীদের মধ্যে ৮২.৩৫% নিজস্ব বাড়িতে, ২.৩৫% সরকারি বাড়িতে বসবাস করে। ভাড়া বাড়িতে বসবাস করে ১৫.২৯% ছাত্রীর পরিবার।

গ্রাফ নং-১৪

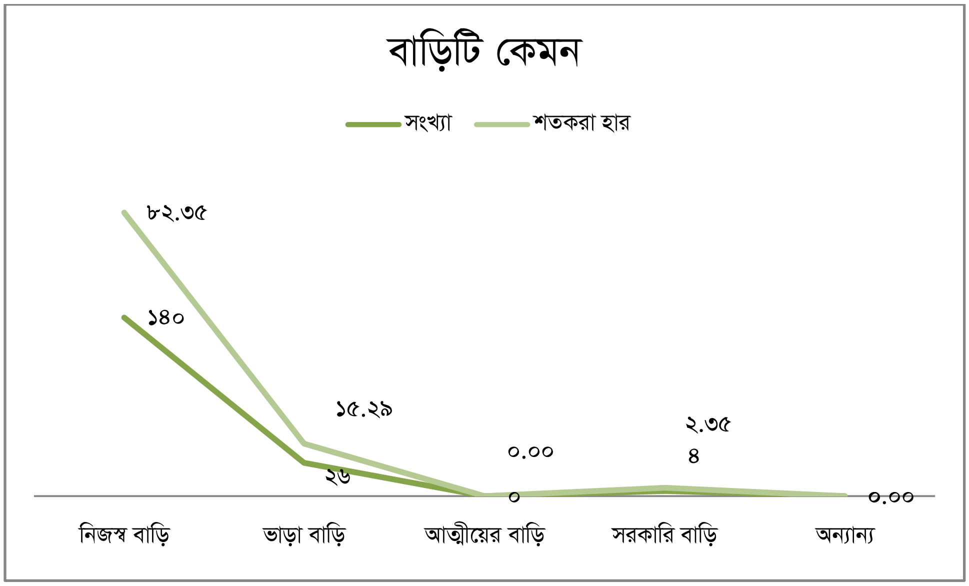

সারণী নং-১৫

কক্ষের সংখ্যা কতটি	সংখ্যা	শতকরা হার
২ টি	৯	৫.২৯
৩ টি	৫০	২৯.৪১
৪টি	৬০	৩৫.২৯
৫টি	৩৮	২২.৩৫
অন্যান্য	১২	৭.০৬
মোট	১৭০	

গ্রাফ নং-১৫

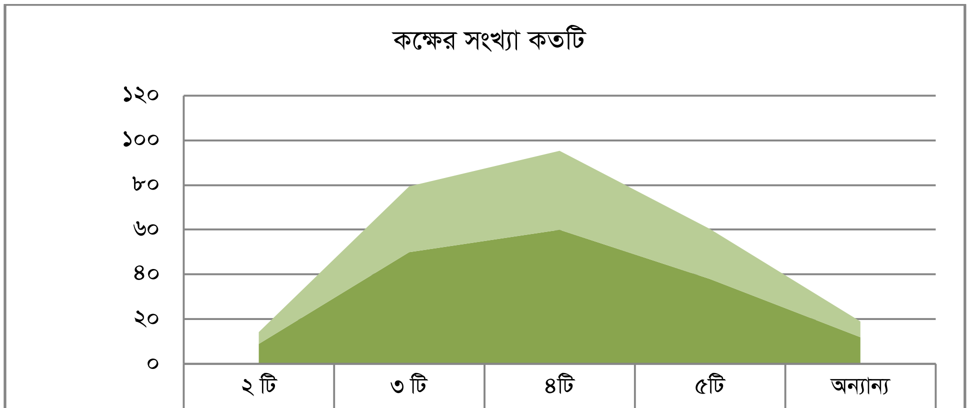

	২ টি	৩ টি	৪টি	৫টি	অন্যান্য
শতকরা হার	৫.২৯	২৯.৪১	৩৫.২৯	২২.৩৫	৭.০৬
সংখ্যা	৯	৫০	৬০	৩৮	১২

উপরোক্ত সারণী,গ্রাফ পর্যালোচনা করে এটা বলা যায় যে, বাড়িতে কক্ষের সংখ্যা ৩,৪, ৫ টি এমণ ছাত্রীর সংখ্যা যথাক্রমে ৫০,৬০,৩৮ জন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রীদের মধ্যে বাড়িতে ৪ টি করে কক্ষ রয়েছে ৩৫.২৯% ছাত্রীর বাড়িতে, ৫ টি করে কক্ষ রয়েছে ২২.৩৫% ছাত্রীর বাড়িতে।

সারণী নং-১৬

ইলেকট্রিসিটির অবস্থা	সংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	১৬৪	৯৬.৪৭
না	৬	৩.৫৩
মোট	১৭০	

গ্রাফ নং-১৬

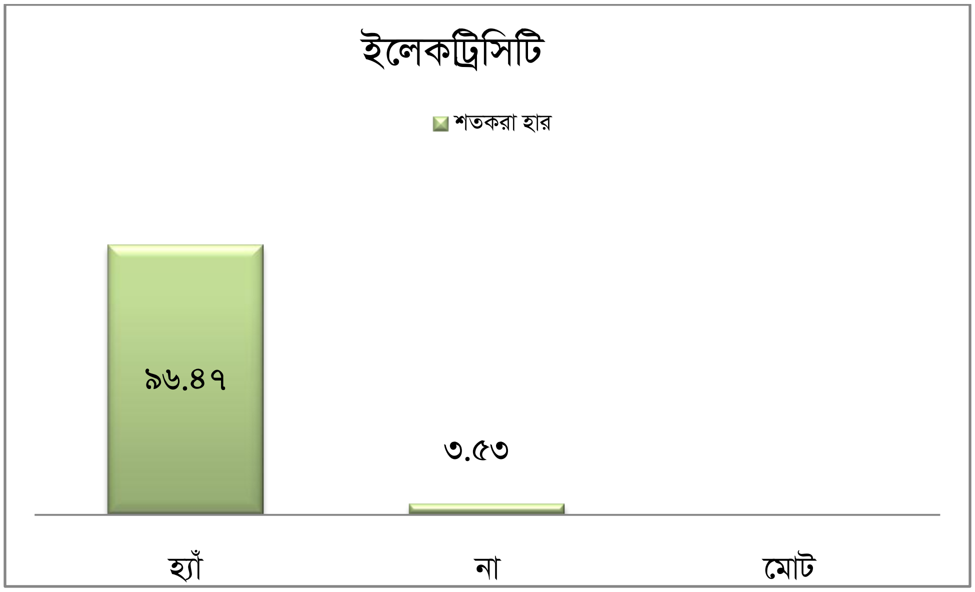

সারণী নং-১৭

স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা	সংখ্যা
হ্যাঁ	১৭০
না	০

গ্রাফ নং ১৭

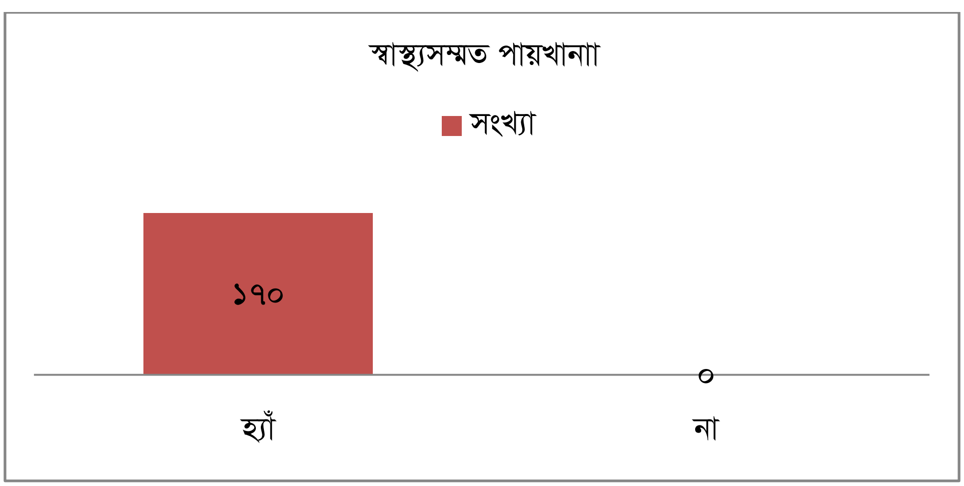

সারণী-১৬,১৭ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, যারা গবেষণায় অংশগ্রহণ করেছেন তাদের মধ্যে ১৬৪ জনের বাড়িতে ইলেকট্রিসিটি রয়েছে আর ৬ জনের বাড়িতে ইলেকট্রিসিটি নেই। সকলের বাড়িতে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা রয়েছে।

গ্রাফ -১৬,১৭পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, ৯৬.৪৭% বাড়িতে ইলেকট্রিসিটি সুবিধা ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা দুই সুবিধাই রয়েছে।

সারণী নং-১৮

নিজস্ব যানবাহন	সংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	৩৫	২০.৫৯
না	১৩৫	৭৯.৪১
মোট	১৭০	

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রীদের মধ্যে শুধুমাত্র ৩৫ জনের চলাচলের জন্য নিজস্ব বাহন রয়েছে। যার মধ্যে অধিকাংশই(মটরসাইকেল, সাইকেল,প্রাইভেট) এর স্বত্তাধিকারী। গ্রাফ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে,৭৯.৪১% বাড়িতে চলাচলের জন্য নিজস্ব বাহন নেই।

গ্রাফ নং-১৮

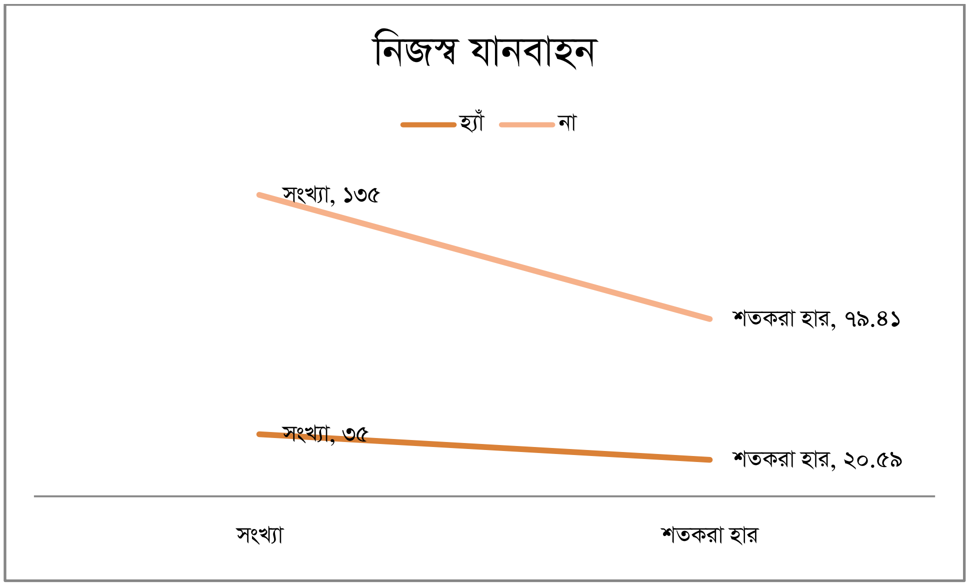

সারণী নং- ১৯

খাবারের অগ্রাধিকার	সংখ্যা	শতকরা হার
ছেলেদের	২	১.১৮
মেয়েদের	১	০.৫৯
উভয়ের	৩৫	২০.৫৯
পরিবার প্রধানগণের	২	১.১৮
সকলের	১৩০	৭৬.৪৭
মোট	১৭০	

গ্রাফ নং-১৯

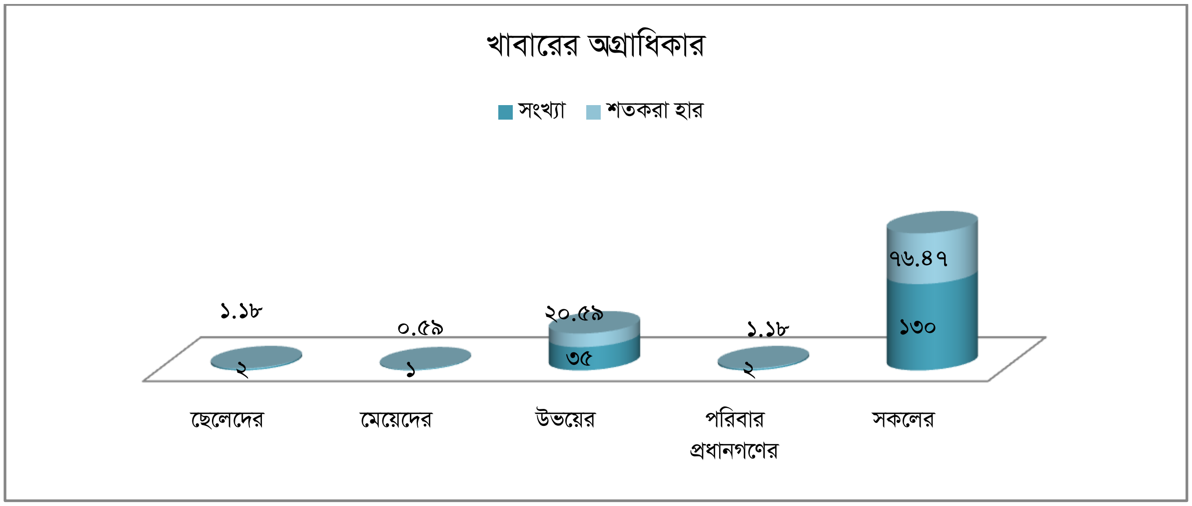

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রীদের মধ্যে পরিবারে ভালো খাবার গ্রহনের অগ্রধিকার সকলের। ৭৬.৪৭% পরিবারে ভালো খাবার গ্রহনের অগ্রাধিকার রয়েছে পরিবারের সবার। ২০.৫৯% পরিবারে ছেলেমেয়ে উভয়ের ভালো খাবার গ্রহনের অগ্রাধিকার রয়েছে।

সারণী নং-২০

চিকিৎসার সহায়তা	সংখ্যা	শতকরা হার
এল্যোপ্যাথি	১৬০	৯৪.১২
কবিরাজি	০	০.০০
ঝাড়-ফুঁক পানি পড়া	০	০.০০
হোমিওপ্যাথি	১০	৫.৮৮
অন্যান্য	০	০
মোট	১৭০	

গ্রাফ নং-২০

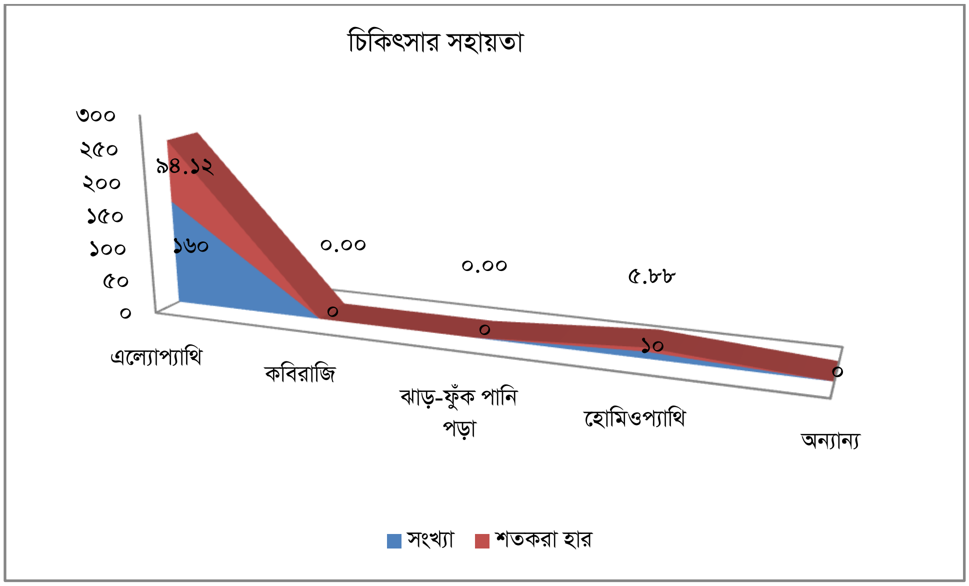

গ্রাফ পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়া যায় যে,ছাত্রীদের পরিবারের সবাই এল্যোপ্যাথি চিকিৎসার সহায়তা নেন। অর্থাৎ ৯৪.১২% পরিবার এলোপ্যাথি চিকিৎসার মাধ্যমে নিজেদের অসুস্থতা সারিয়ে তোলেন। মাত্র ৫% পরিবার হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার সহায়তা নেন। তবে অনেক পরিবার চিকিৎসার ক্ষেত্রে এল্যোপ্যাথি,হোমিওপ্যাথি উভয় ধরনের চিকিৎসার সহায়তা নিয়ে থাকেন।

সারণী নং-২১

চিকিৎসার অগ্রাধিকার	সংখ্যা	শতকরা হার
ছেলেদের	১	০.৫৯
মেয়েদের	২	১.১৮
উভয়ের	২৫	১৪.৭১
পরিবার প্রধানগনের	২	১.১৮
সকলের	১৪০	৮২.৩৫
মোট	১৭০	

গ্রাফ নং-২১

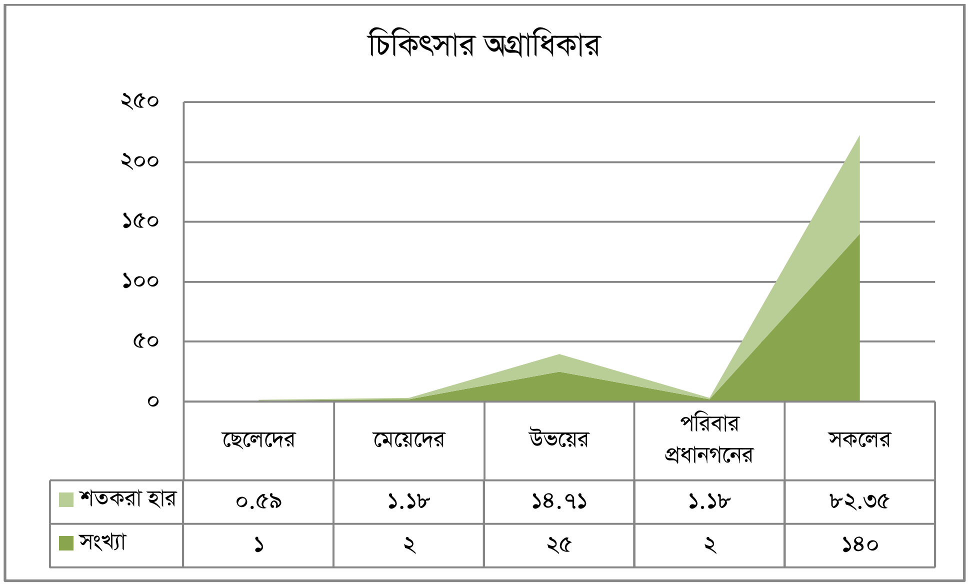

উপরের গ্রাফ থেকে দেখা যায় যে, ছাত্রীদের পরিবারে সকলের চিকিৎসার অধিকার রয়েছে প্রায় ১৪০ জনের পরিবারে। ২৫ জনের পরিবারে ছেলে ও মেয়ে উভয়ের চিকিৎসায় অংশগ্রহনের অধিকার রয়েছে। শুধুমাত্র ২জনের পরিবারে মেয়েদের চিকিৎসায় অগ্রাধিকার রয়েছে। ছাত্রীদের মধ্যে ৮২.৩৫% পরিবারে সকলের চিকিৎসার অগ্রাধিকার রয়েছে। শুধুমাত্র .৫৯% পরিবারে ছেলেদের ও ১.১৮% পরিবারে মেয়েদের চিকিৎসার অগ্রাধিকার রয়েছে।

রাজনৈতিক বিষয়

সারণী নং-২২

রাজনীতিতে অংশগ্রহন	*সংখ্যা*	*শতকরা হার*
বেশি সমর্থন দেয়	২০	১১.৭৬
সমর্থন করে না	৫৫	৩২.৩৫
কিছুটা সমর্থন করে	৬০	৩৫.২৯
একেবারে সমর্থন করে না	৩৫	২০.৫৯
মোট	১৭০	

সারণী থেকে বলা যায় যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রীদের মধ্যে রাজনীতিকে কিছুটা সমর্থন করে এমন ছাত্রীর সংখ্যা কিছুটা বেশি অপরদিকে একেবারে সমর্থন করে না এমন ছাত্রীর সংখ্যা কম।

গ্রাফ নং-২২

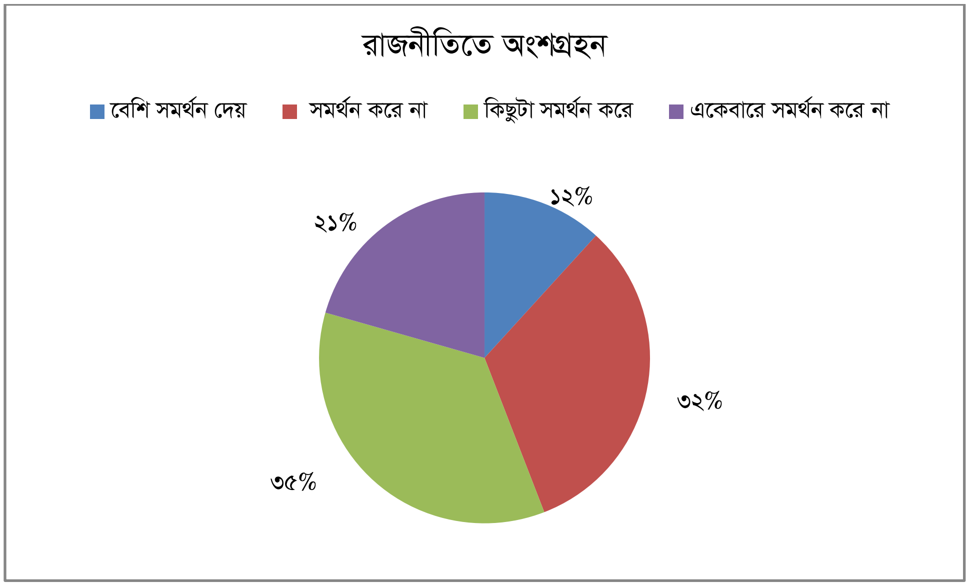

গ্রাফ পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, রাজনীতিকে কিছুটা সমর্থন করে ৩৫.২৯% ছাত্রী, বেশি সমর্থন করে দেয় ১১.৭৬%, সমর্থন করে না ৩২.৩৫% ছাত্রী এবং একেবারে সমর্থন করে না ২০.৫৯% ছাত্রী।

সারণী নং-২৩

মতামত প্রকাশ	সংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	১৬৬	৯৭.৬৫
না	৪	২.৩৫
মোট	১৭০	

মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের অন্যতম হাতিয়ার। অধ্যয়নরত ছাত্রীদের সকলের পরিবারে মতামত প্রকাশ করার স্বাধীনতা রয়েছে। শুধুমাত্র ৪ জন ছাত্রী তাদের পরিবারে নিজস্ব বিষয়ে মতামত প্রকাশ করতে পারে না।

গ্রাফ নং-২৩

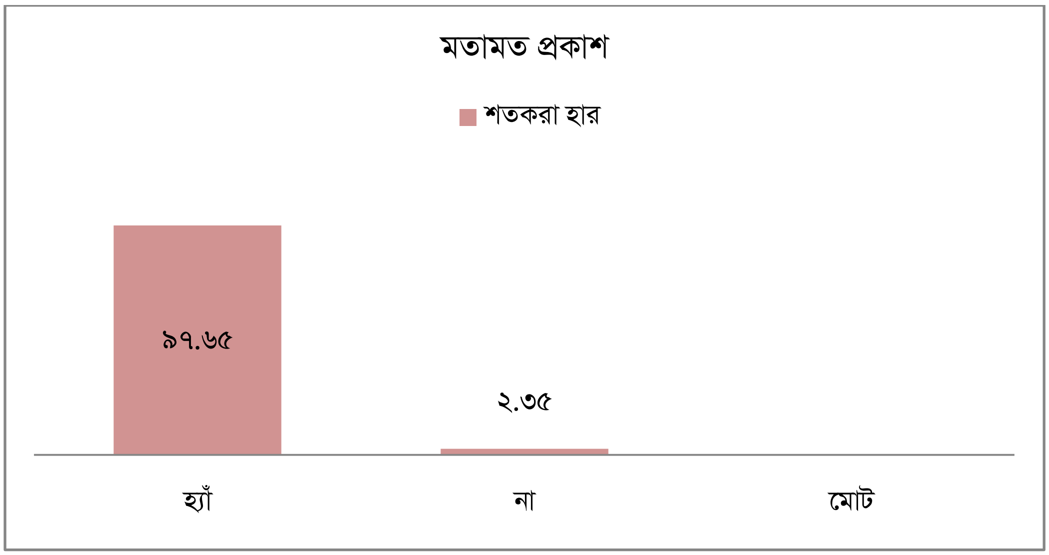

গ্রাফ পর্যালোচনা করে বলা যায়, ৯৭.৬৫% পরিবার তাদের মেয়েদের মতামতকে পরিবারে অগ্রাধিকার দিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহন করে।

সারণী নং-২৪

ভোট দেয়ার অধিকার	সংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	১৬৬	৯৭.৬৫
না	৪	২.৩৫
মোট	১৭০	

ভোট দেয়ার অধিকার একজন মানুষের অন্যতম রাজনৈতিক অধিকার। ছাত্রীদের ভোটদেয়ার অধিকারে তাদের পরিবারে সমর্থন রয়েছে।

গ্রাফ নং-২৪

গ্রাফ থেকে বলা যায়, প্রায় ৯৭.৬৫% পরিবার তাদের মেয়েদের ভোট দেয়ার অধিকারকে সমর্থন দেয়। ২.৩৫% পরিবার ছাত্রীদের ভোট দেয়ার অধিকার সমর্থন করে না।

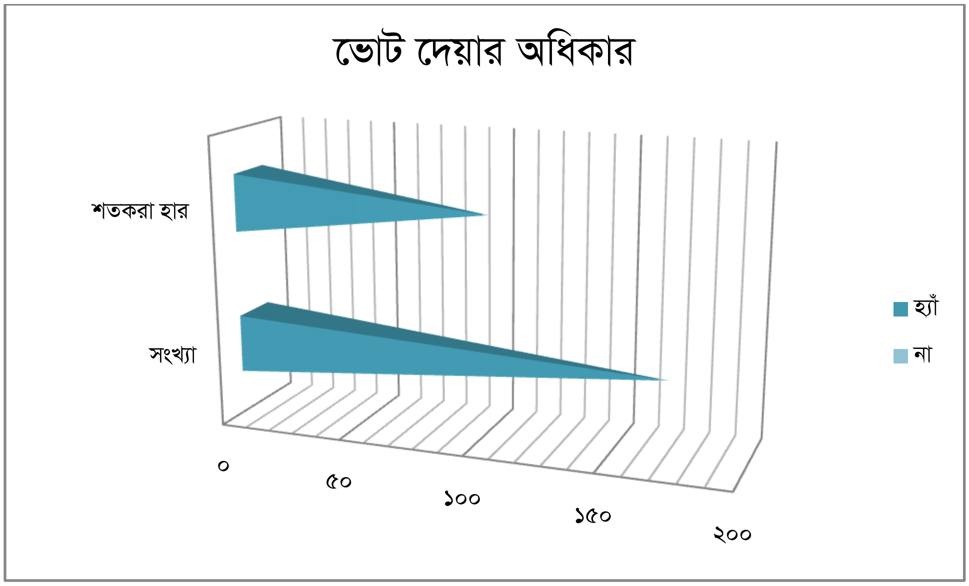

সারণী নং-২৫

ধর্মীয় বিধি-নিষেধ	সংখ্যা	শতকরা হার
অনেক বেশি	৮২	৪৮.২৪
কিছুটা অনুসরন করা হয়	৭৫	৪৪.১২
একেবারে অনুসরন করা হয় না	০	০.০০
মন্তব্য নেই	১৩	৭.৬৫
মোট	১৭০	

গ্রাফ নং-২৫

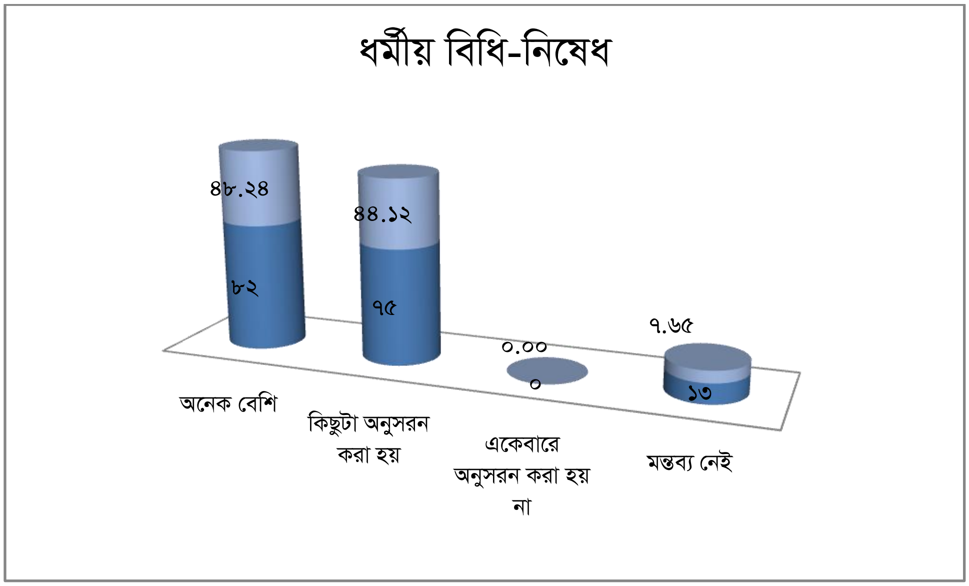

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রীদের পরিবারের মধ্যে প্রায় ৪৮.২৪% পরিবারে অনেক বেশি ধর্মীয় বিধি-নিষেধ অনুসরণ করা হয়। ধর্মীয় বিধি-নিষেধ অনুসরণ করা হয় না, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন পরিবারের অস্তিত্ব নেই। যাদের পরিবারে ধর্মীয় বিধিনিষেধন অনুসরণে কিছুটা শিথিলতা রয়েছে এমন পরিবারের সংখ্যা ৪৪.১২%। ধর্মীয় বিষয়ে কোনরকম মন্তব্য করতে চান নি, এমন ছাত্রীর সংখ্যা ৭.৬৫%।

সাংস্কৃতিক, নৈতিক, সামাজিক দিক

সারণী নং-২৬

সাংস্কৃতিক চর্চা	সংখ্যা
বই পড়া	১০১
টি.ভি. দেখা	৭১
নাচ,গান করা	১৬
ভ্রমন করা	৩৭
অন্যান্য	৩৭
মোট	২২৮

গ্রাফ নং-২৬

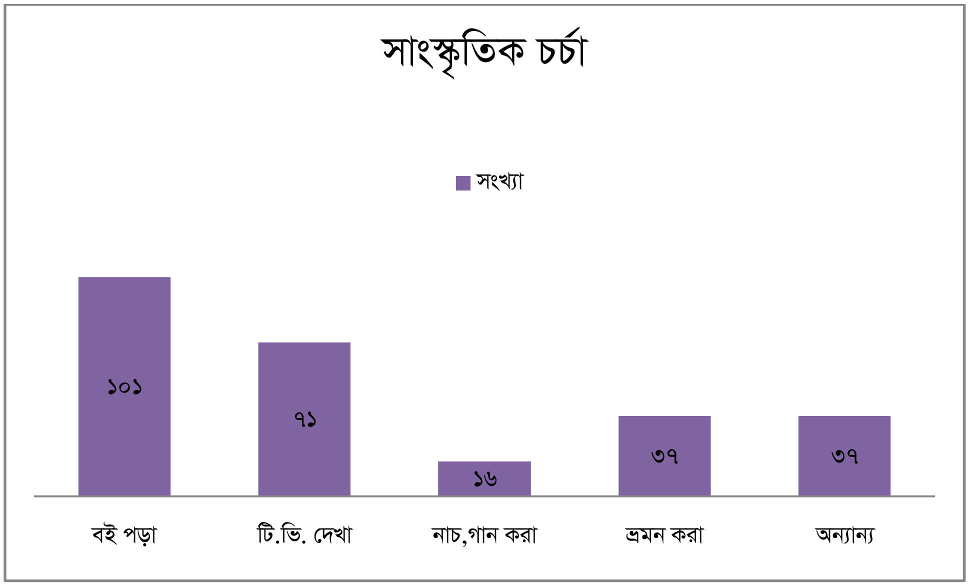

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রীদের মধ্যে সাংস্কৃতিক চর্চায় বই পড়তে পছন্দ করেন বেশির ভাগ ছাত্রীর পরিবার। অনেক ছাত্রীর পরিবার আবার সাংস্কৃতিক চর্চায় বই পড়া, টি.ভি দেখা এই দুই বিষয়কে প্রাধান্য দিয়েছেন। তবে ছাত্রীদের পরিবার গুলো সাংস্কৃতিক চর্চায় একসাথে দুইটি, তিনটি ও চারটি পন্থা অনুসরন করেন।

সারণী নং -২৭

সাংস্কৃতিক চর্চায় প্রতিবন্ধকতা	সংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	৩৩	১৯.৪১
না	১৩৭	৮০.৫৯
মোট	১৭০	

গ্রাফ নং-২৭

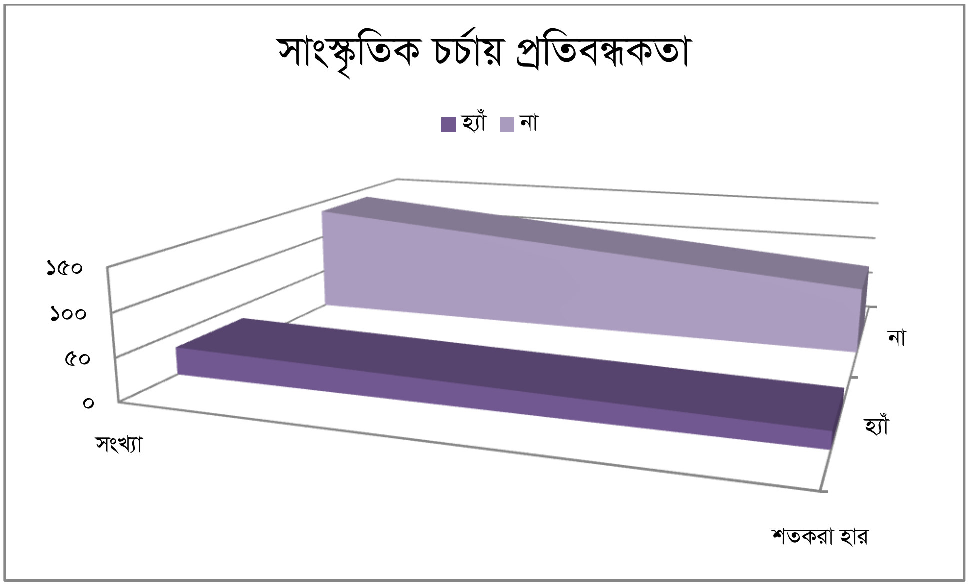

পরিবারে সাংস্কৃতিক চর্চায় প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয় না অধিকাংশ ছাত্রী। গবেষণায় দেখা যায় প্রায় ৮০.৫৯% ছাত্রীর পরিবারে সাংস্কৃতিক চর্চায় প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হন না। মাত্র ১৯.৪১% ছাত্রী তাদের পরিবারে সাংস্কৃতিক চর্চায় প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়।

সারণী নং-২৮

পছন্দের অনুষ্ঠান	সংখ্যা
বিনোদনমূলক	১১৪
শিক্ষামূলক	৫২
খেলাধুলামূলক	৩৪
অনুসন্ধানমূলক	৪২
অন্যান্য	৫
মোট	২৪৭

গ্রাফ নং -২৮

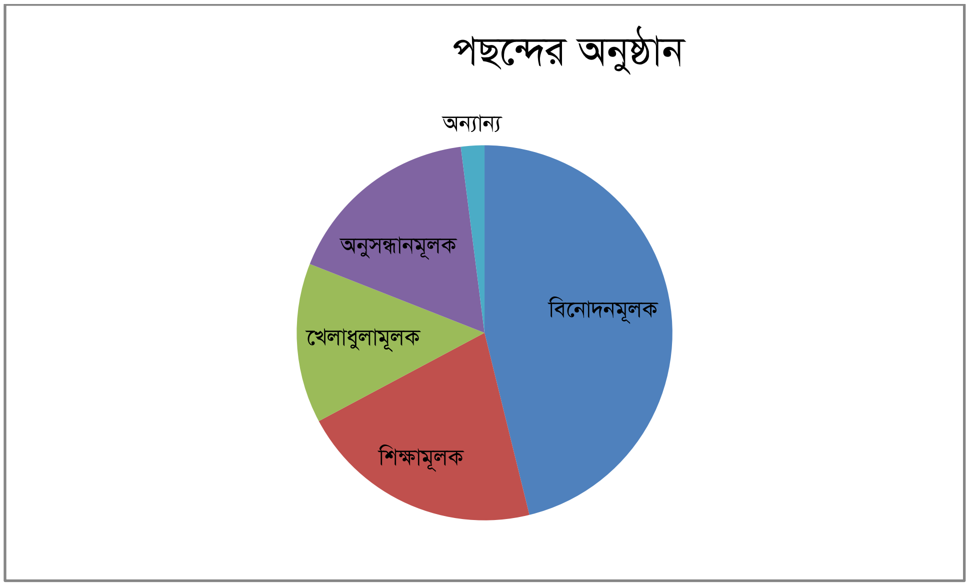

ছাত্রীদের পরিবারের সদস্যরা টি.ভি.তে বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান দেখতে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেন। তবে বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের সাথে অনেক পরিবারে শিক্ষামূলক, অনেক পরিবারে খেলাধুলামূলক, অনুসন্ধানমুলক ও অনুষ্ঠান দেখে থাকে। গ্রাফ থেকে বলা যায়, কোন পরিবার টি.ভি তে শুধুমাত্র একটি বিষয় দেখেন না, বরং সকল অনুষ্ঠানের সমন্বয়ে বিনোদন লাভ করে থাকেন।

সারণী নং- ২৯

মেয়েদের উচ্চশিক্ষা	সংখ্যা	শতকরা
খুব বেশি	১৬০	৯৪.১২
মোটামুটি	১০	৫.৮৮
সামান্য	০	০.০০
মন্তব্য নেই	০	০.০০
মোট	১৭০	

গ্রাফ নং-২৯

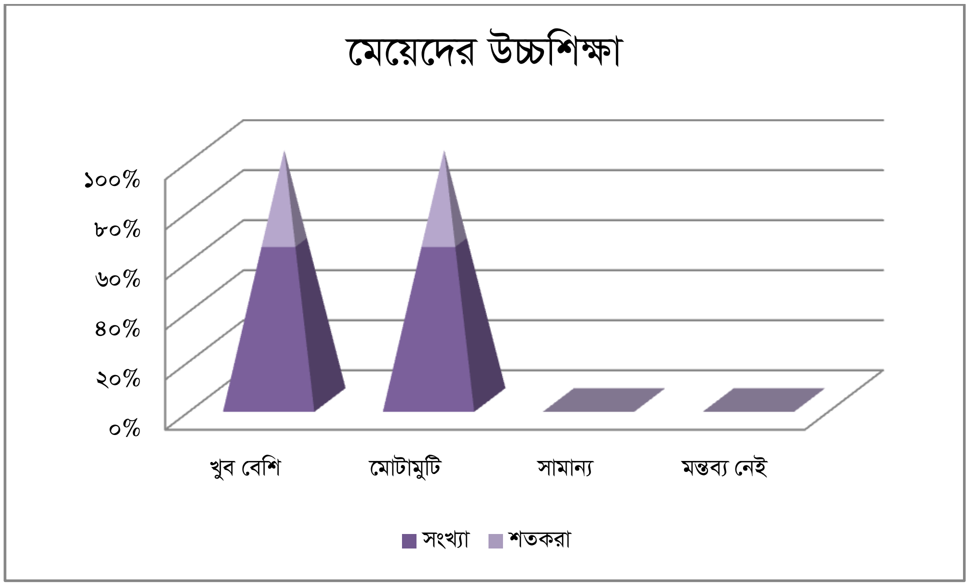

মেয়েদের উচ্চ শিক্ষায় খুব বেশি আগ্রহী ৯৪.১২% পরিবার। মেয়েদের উচ্চশিক্ষায় আগ্রহী নয় এমন কোন পরিবার নেই।

সারণী নং-৩০

পিতামাতার আগ্রহ	সংখ্যা	শতকরা
স্নাতকোত্তর	২	১.১৮
স্নাতক	২৭	১৫.৮৮
এম.ফিল.	১	০.৫৯
পি.এইচ.ডি.	১৩০	৭৬.৪৭
অন্যান্য	১০	৫.৮৮
মোট	১৭০	

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রীদের পরিবারে তাদের শিক্ষার উচ্চস্তর এম.ফিল. ,পি.এইচ.ডি. পর্যন্ত পড়াতে আগ্রহী।

গ্রাফ নং-৩০

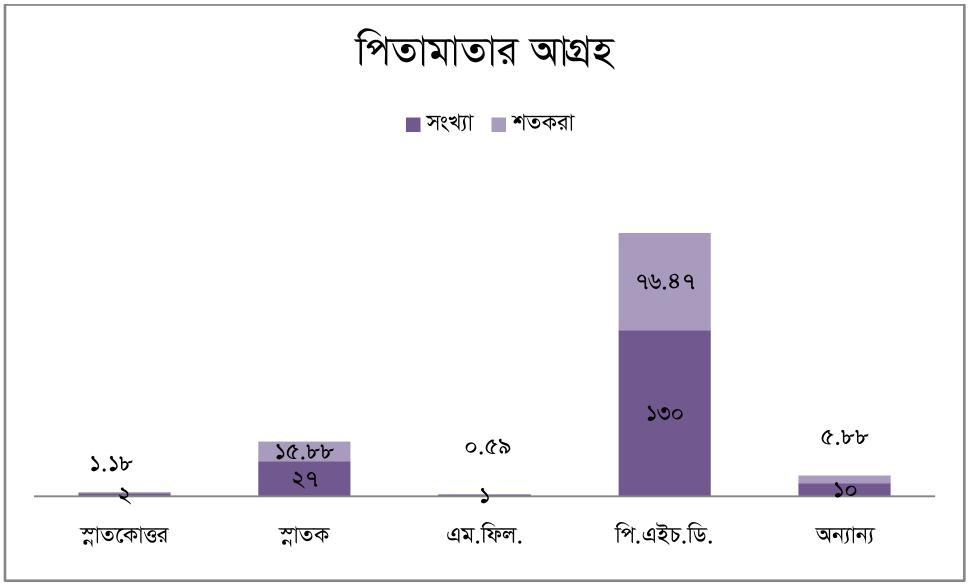

৭৬.২৯% পরিবার তাদের মেয়েদের পি.এইচ.ডি. পর্যন্ত পড়াতে আগ্রহী ।স্নাতক পর্যন্ত পড়াতে আগ্রহী ১৫.৮৮% পরিবার। স্নাতকোত্তর পর্যন্ত পড়াতে আগ্রহী ১.১৮% । এছাড়া আরও বেশি পড়াতে ৫.৮৮% পরিবার।

সারণী নং-৩১

আপনার মতামতের গুরুত্ব	সংখ্যা	শতকরা হার
খুব বেশি	৯০	৫২.৯৪
মোটামুটি	৭৪	৪৩.৫৩
সামান্য	১	০.৫৯
মন্তব্য নেই	৫	২.৯৪
মোট	১৭০	

গ্রাফ নং-৩১

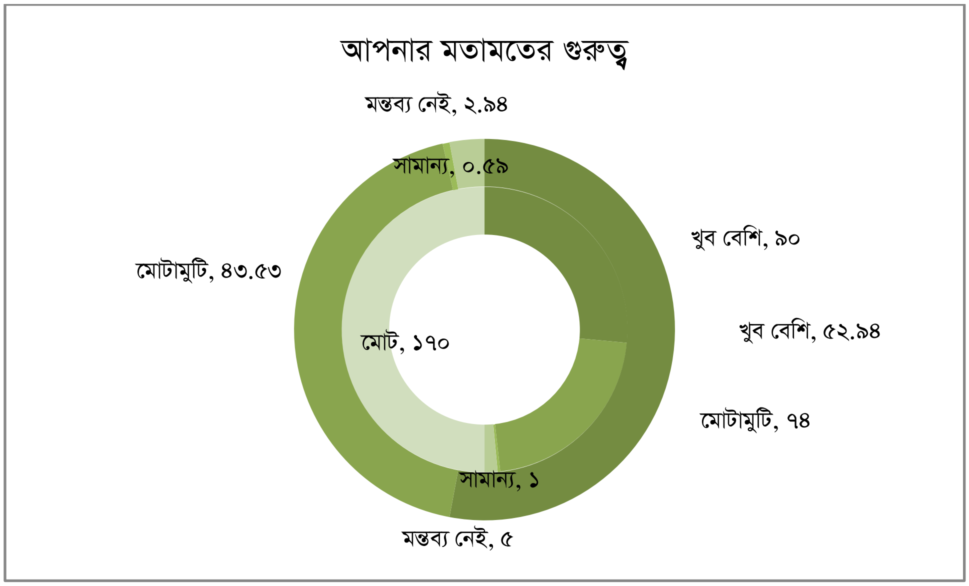

উপরের গ্রাফ থেকে বলা যায় যে, ,৫২.৫৪% ছাত্রীর পরিবারে তাদের নিজের মতামতকে গুরুত্ব দেয়া হয়। নিজের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষেত্রে ছাত্রীদের মতামতকে মোটামুটি প্রাধান্য দেয় ৪৩.৫৩% পরিবার। আবার দেশের উচ্চপর্যায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহনে নারীর অংশগ্রহনের বিষয়টিকে প্রায় সব ছাত্রীর পরিবার সমর্থন করে। ৯০% ছাত্রীর পরিবার দেশের উচ্চ পর্যায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহনে নারীর অংশগ্রহনের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়। মাত্র ২.৯৪% ছাত্রীর পরিবারে দেশের উচ্চ পর্যায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহনে তাদের অংশগ্রহনকে গুরুত্ব দেয়া হয় না।

সারণী নং-৩২

নারীশিক্ষায় প্রতিবন্ধকতা	সংখ্যা	শতকরা হার
অজ্ঞতা	৬	৩.৫৩
সামাজিক বাধা	৩০	১৭.৬৫
ছেলেসন্তানের অগ্রাধিকার	১	০.৫৯
পিতামাতার অদূরদর্শিতা	১৩	৭.৬৫
কোন রকম প্রতিবন্ধকতা তৈরী করে না	১২০	৭০.৫৯
মোট	১৭০	

গ্রাফ নং-৩২

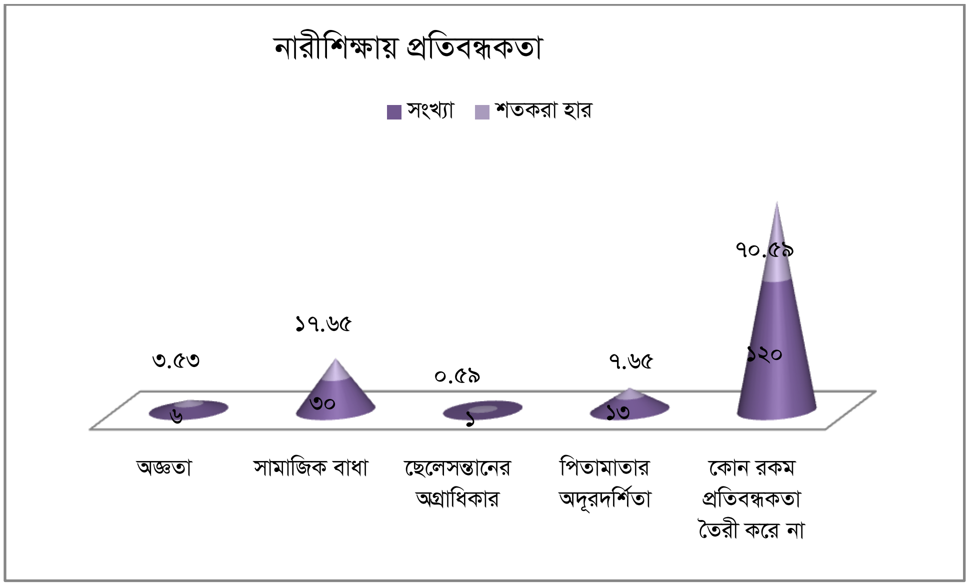

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রীরা তাদের পরিবার থেকে কোন রকম প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হন না। তবে কিছু ছাত্রী শিক্ষাগ্রহনের ক্ষেত্রে সামাজিক বাধার সম্মুখীন হয়েছেন। প্রায় ৭০.৫৯% ছাত্রী তাদের পরিবার থেকে শিক্ষাগ্রহনে কোন রকম প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হননি। সামাজিক বাধার সম্মুখীন হয়েছেন ১৭.৬৫% ছাত্রী। অজ্ঞতার কারনে শিক্ষাগ্রহনে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে ৩.৫৩% ছাত্রী। অনেক ক্ষেত্রে পিতামাতার অদুরদর্শিতা ছাত্রীদের শিক্ষা গ্রহনে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন করেছে।

সামাজিক বাধার কারণে যেসব ছাত্রীর শিক্ষাগ্রহন কে বাধাগ্রস্থ হয়েছে, তারা সেযব মন্তব্য করেছে তা নিম্নরুপ:

-" এটা করো না, ওটা করো না, মানুষ খারাপ বলবে।"

-" সমাজ বলে মেয়েদের তাড়াতাড়ি বিয়ে দিতে।"

-“পরিবারের ইচ্ছা সত্ত্বেও সামাজিক বাধা নিষেধের কারণে নারী শিক্ষার প্রতিবন্ধকতা তৈরী হয়, বিদেশে উচ্চশিক্ষা” । আবার যাদের পরিবার নারী শিক্ষায় কোন রকম প্রতিবন্ধকতা করেন না । তারা যেসব মন্তব্য করেছে, তা হলো-

-“বাবা-মা খুব বেশি সাহায্যপ্রবণ । তারা চিন্তা চেতনায় অনেক আধুনিক ও দূরদর্শী । মেয়ে বলে হীনমন্যতা নেই বরং তারা আমাকে নিয়ে গর্বিত ।”

পিতামাতার অদুরদর্শীতা যাদের শিক্ষাগ্রহনে প্রতিবন্ধকতা তৈরী করে তারা মনে করেন-

“পিতামাতা উচ্চশিক্ষিত না হওয়ায় তারা অনেক কিছুই বোঝে না ।”

সারণী নং- ৩৩

বিবাহের বয়সসীমা	সংখ্যা	শতকরা হার
২১ বছর এর নিচে	৩	১.৭৬
২২-২৪ বছর	৬৫	৩৮.২৪
২৪-২৬ বছর	৬২	৩৬.৪৭
২৬-২৭ বছর	৩৫	২০.৫৯
২৭ এর অধিক	৫	২.৯৪
মোট	১৭০	

ছাত্রীদের বিবাহের বয়সসীমা সর্ম্পকে পিতামাতার মন্তব্যের বিভিন্নতা করা যায় সারণী ৩৩ থেকে ।

গ্রাফ নং-৩৩

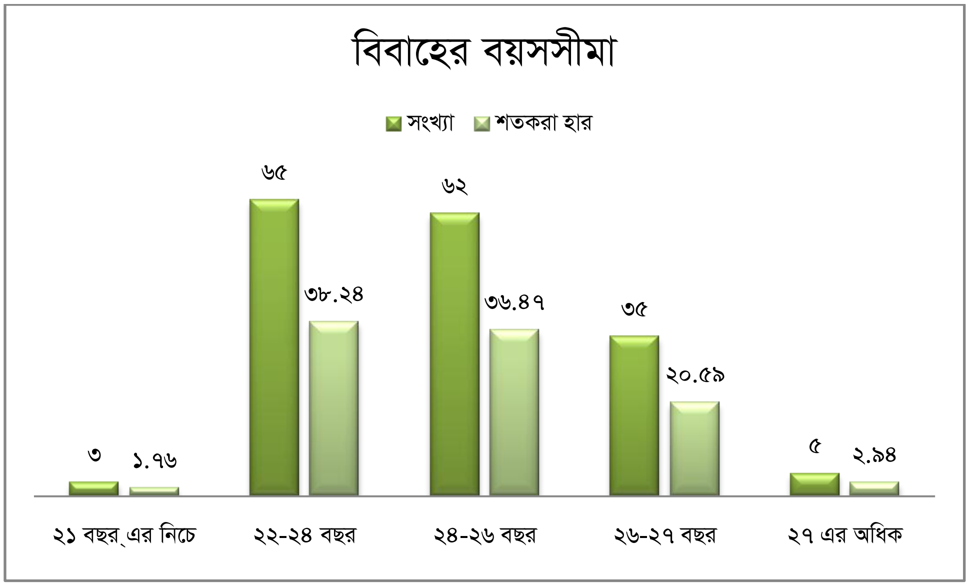

অধ্যয়নরত ছাত্রীদের পিতামাতার মধ্যে ৩৮.২৪% পিতামাতা (২২-২৪) বছরের মেয়েদের বিয়ে দেয়ার পক্ষপাতী। ৩৬.৪৭% পিতামাতা তাদের মেয়েদের বিয়ে দিতে আগ্রহী (২৪-২৬)বছর বয়সে। (২৬-২৭) বছরে বিয়ে দেয়ার আগ্রহী পিতামাতা মোট ২০.৫৯%। মাত্র ২.৯৪% পিতামাতা তাদের মেয়েদের ২৭ এর অধিক বয়সে বিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে আগ্রহী। আবার ২১ বছর এর নিচে বিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে আগ্রহী মাত্র ১.৭৬% পিতামাতা।

ফলাফল

সাংস্কৃতিক, নৈতিক ও সামাজিক দিক

সারণী নং -৩৪

যৌতুক প্রদান	সংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	১	০.৫৯
না	১৬৯	৯৯.৪১
মোট	১৭০	

গ্রাফ নং-৩৪

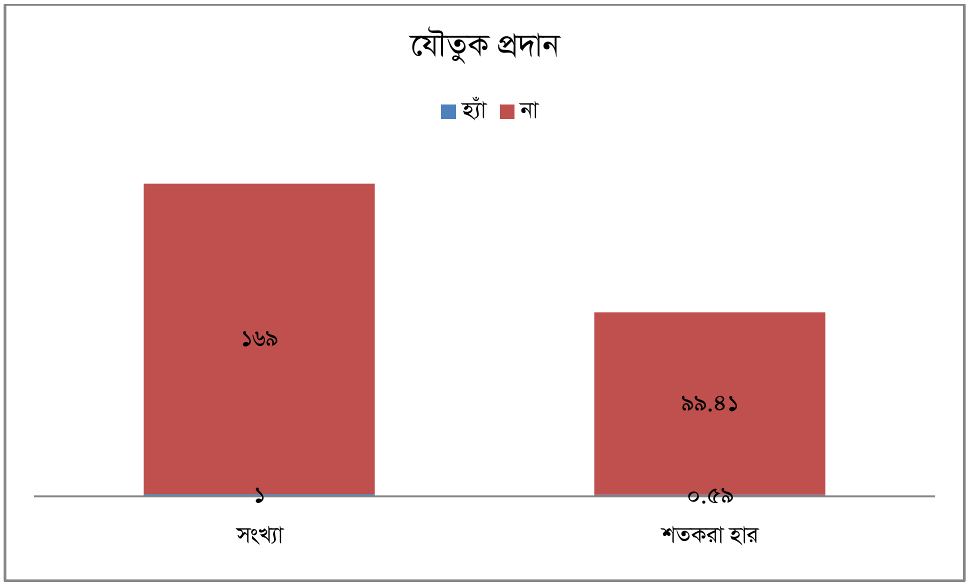

বিবাহের ক্ষেত্রে যৌতুক প্রদান একটি সামাজিক ব্যাধি। বিবাহের ক্ষেত্রে যৌতুক প্রদানকে কোন ছাত্রীর পরিবার সমর্থন করে না। ৯৯.৪১% ছাত্রী বিবাহের ক্ষেত্রে যৌতুক প্রদান সমর্থন করে না।

বিবাহের ক্ষেত্রে যৌতুক প্রদান বিষয়ে যেসব মন্তব্য ছাত্রীরা করেছে, সেগুলো মধ্যে অধিকাংশ ছাত্রী যৌতুক সর্ম্পকে বলেছে-

"যৌতুক একটি সামাজিক ব্যাধি। যৌতুক দেয়ানেয়া আইনত দন্ডনীয় অপরাধ। তাদের পরিবার আইন,ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল।"

"শ্বশুড় বাড়ি থেকে জিনিসপত্র মেরুদন্ডহীন লোকেরাই আনে। তারা কোন দিন সোজা হয়ে দাড়াতে পারে না। সামাজিক মূল্যবোধ,শিক্ষাচর্চা, ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলায় যৌতুক কোন ভাবেই সমর্থন করা যায় না।"

"যৌতুক সামাজিক মুল্যবোধের উপর আঘাত হানে।"

" যৌতুক চাওয়াকে অভদ্র আচরন বলে গণ্য করা হয়।"

সারণী নং- ৩৫

পারিবারিক বন্ধন রক্ষা	সংখ্যা	শতকরা
হ্যাঁ	১৭০	১০০
না	০	০
মোট	১৭০	

গ্রাফ নং-৩৫

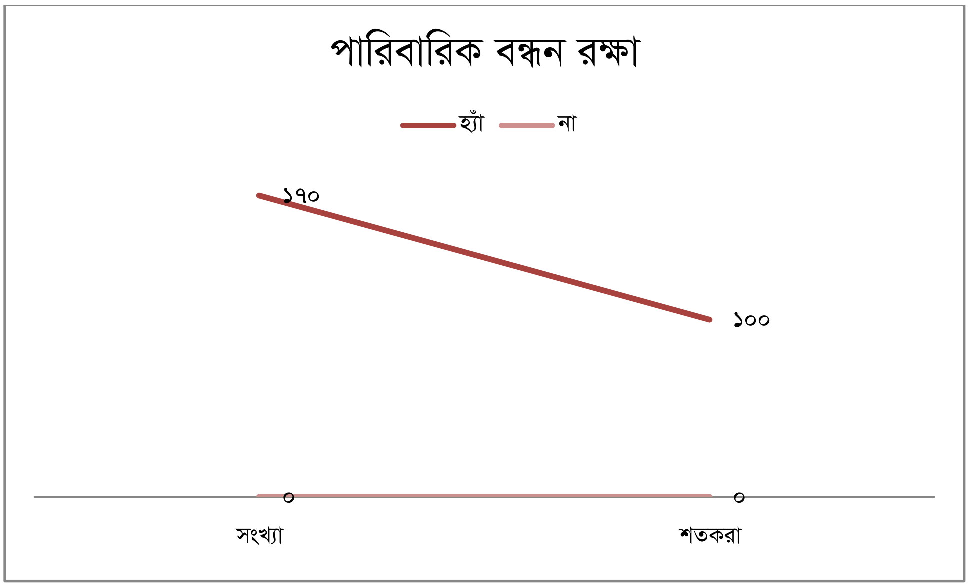

যে কোন পরিবারে বন্ধন রক্ষা করার ক্ষেত্রে মেয়েরা অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। পারিবারিক বন্ধন রক্ষা করার ক্ষেত্রে মেয়েদের ভূমিকা প্রায় ১০০%।

সারণী নং-৩৬

নারী পুরুষের ভূমিকা	সংখ্যা	শতকরা
নারীর চেয়ে পুরুষের অবদান বেশি	৭	৪.১২
পুরুষের চেয়ে নারীর অবদান বেশি	১১	৬.৪৭
দুজনেরই সমান	১৫২	৮৯.৪১
মোট	১৭০	

গ্রাফ নং- ৩৬

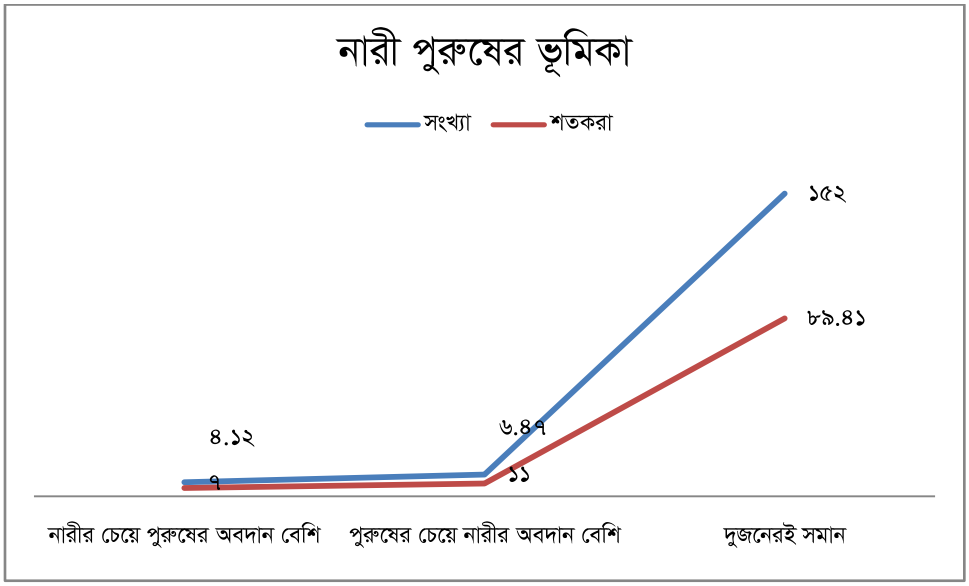

পরিবার একটি সামগ্রিক ধারণা। নারী পুরুষ দু 'জনের ভূমিকার সমষ্টি হল পরিবার। পরিবারে নারীপুরুষ দু'জনের ভূমিকা সমান এমন মন্তব্য করেছে ৮৯.৪১% ছাত্রী। পুরুষের চেয়ে নারীর অবদান বেশি এমন মতামত দিয়েছে ৬.৪৭% ছাত্রী। আবার অনেকে নারীর অবদান পুরুষের চেয়ে বেশি বলে মতামত দিয়েছেন ৪.১২% ছাত্রী।

সারণী নং-৩৭

পরিবারের কাজ	সংখ্যা	শতকরা হার
শুধু বাবা করেন	০	০
শুধু মা করেন	১৫	৮.৮২
সকলে মিলে করা হয়	১৩০	৭৬.৪৭
পরিচারিকা সহযোগে করা হয়	২৫	১৪.৭১
মোট	১৭০	

গ্রাফ নং-৩৭

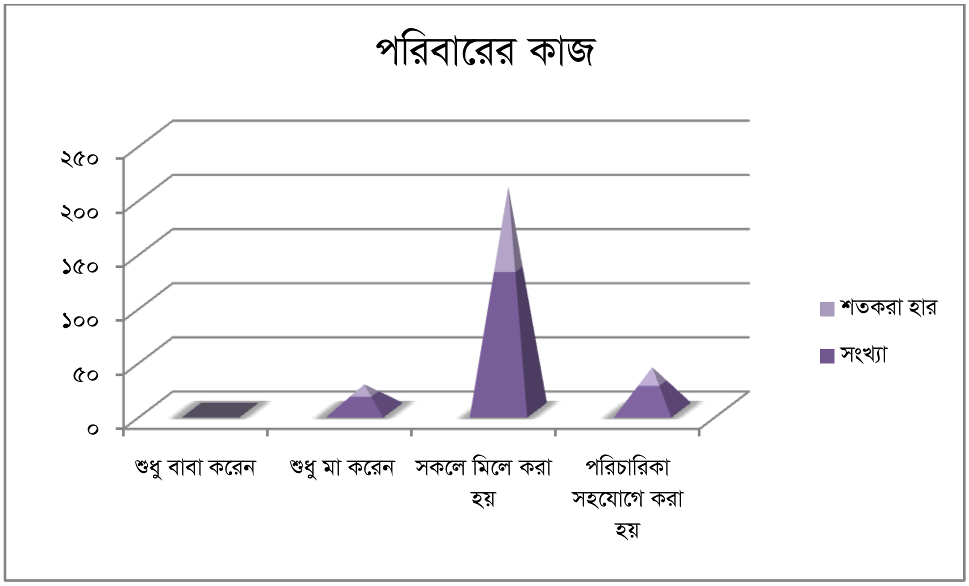

পরিবারে আমরা বাবামা ,ভাইবোনসহ সকলে মিলে একসাথে থাকি। পরিবার পরিচালিত হয় বাব-মার সম্মিলিত প্রচেষ্টায়। পরিবারের কাজগুলো সকলে মিলে করা হয় বাবামার সম্মিলিত প্রচেষ্টায়। পরিবারের কাজগুলো সকলে মিলে করা হয় ৭৬.৪৭% ছাত্রীর পরিবারে। পরিবারের কাজগুলো পরিচারিকা সহযোগে করা হয় ১৪.৭১% ছাত্রীর পরিবারে। আবার পরিবারের কাজগুলো শুধু মা করেন এমন পরিবার রয়েছে ৮.৮২%।

সারণী নং-৩৮

মর্যাদা	সংখ্যা	শতকরা
একই মর্যাদার	১০৪	৮০
দুজনের মর্যাদা আলাদা	২৬	২০
মোট	১৩০	

গ্রাফ নং-৩৮

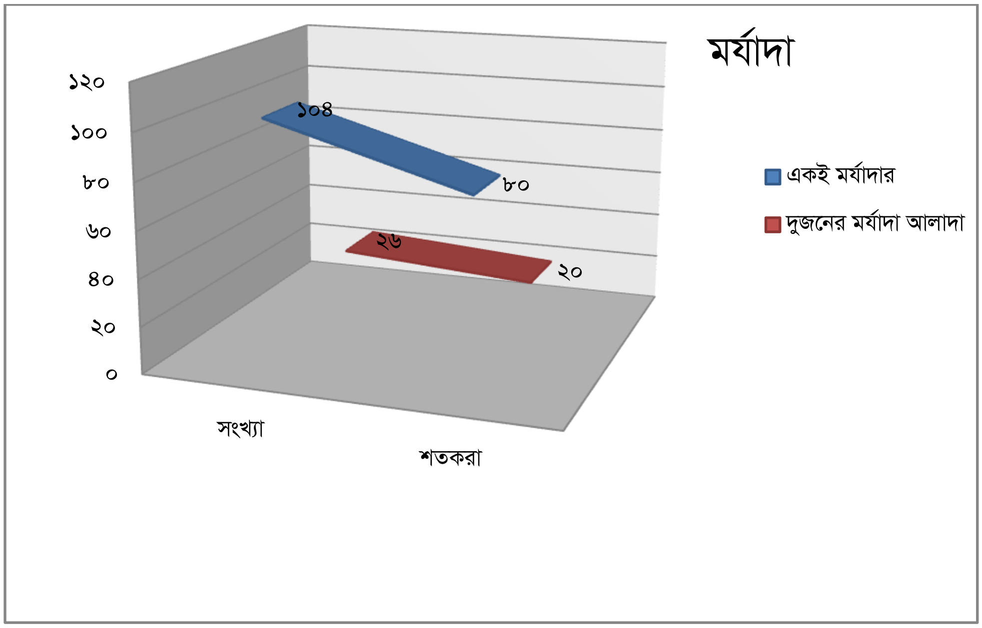

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রীদের পরিবারে ভাইবোনদের অবস্থান বিবেচনায় তেমন কোন পার্থক্য নেই। পরিবারে ভাইবোনের মর্যাদা সমান এমন মন্তব্য করেছেন ৮০% ছাত্রী।যেহেতু প্রশ্নটি ছিল পরিবারে যদি ভাই থাকে,সেক্ষেত্রে অনেক পরিবারে শুধুমাত্র বোন রয়েছে তারা এই প্রশ্নের উত্তর দেয়া থেকে নিজেকে বিরত রেখেছে। যারা উত্তর দিয়েছে তাদের মধ্যে মাত্র ৮০% পরিবারে ভাইবোনকে সমান দৃষ্টিতে দেখা হয়। ভাইবোনে দু'জনের মর্যাদা আলাদা এমন মন্তব্য করেছে মাত্র ২০% ছাত্রী।

সারণী নং-৩৯

চাকরীতে প্রবেশ	সংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	৭	৪.১২
না	১৬৩	৯৫.৮৮
মোট	১৭০	

গ্রাফ নং-৩৯

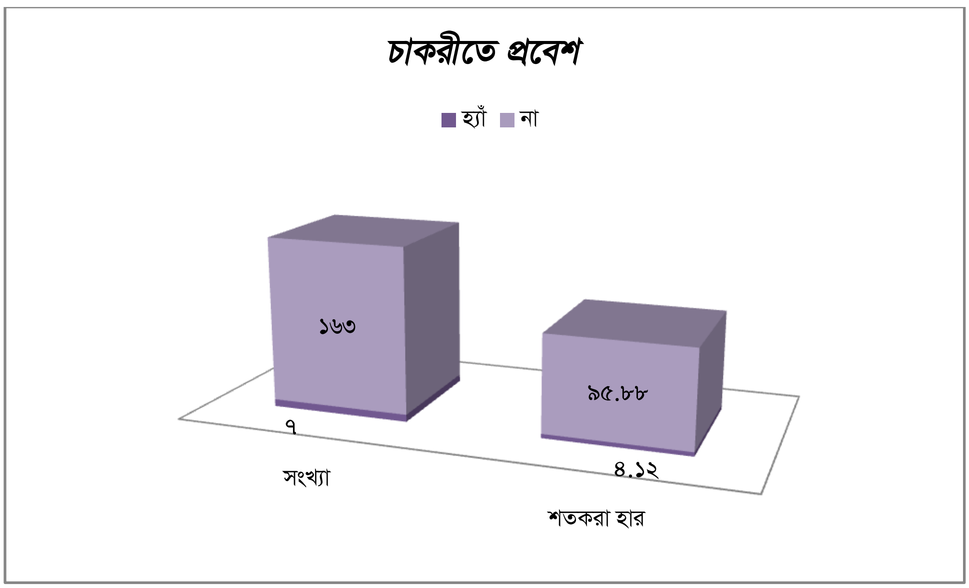

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষা শেষ করে চাকরিতে প্রবেশের ক্ষেত্রে কোন বাধা নেই পরিবার থেকে। ৯৫.৮৮% ছাত্রীর পরিবারে তাদের শিক্ষাজীবন শেষ করে চাকরিতে প্রবেশে ক্ষেত্রে সম্মতি রয়েছে। শুধুমাত্র ৪.১২% ছাত্রীর পরিবারে তাদের শিক্ষাজীবন শেষে চাকরিতে প্রবেশের ক্ষেত্রে বাধা রয়েছে।

সারণী নং-৪০

কাঙ্খিত ব্যক্তিত্ব	সংখ্যা	শতকরা
হ্যাঁ	১৬০	৯৪.১২
না	১০	৫.৮৮
মোট	১৭০	

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রীদের কাঙ্খিত ব্যক্তিত্ব বিকাশে পরিবারের ভূমিকা অগ্রগণ্য। ছাত্রীরা মনে করে তাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশে তাদের পরিবারের ভূমিকা রয়েছে। ৯৪.১২% ছাত্রী তাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশে পরিবারের অবদানের কথা স্বীকার করেছে।

গ্রাফ নং-৪০

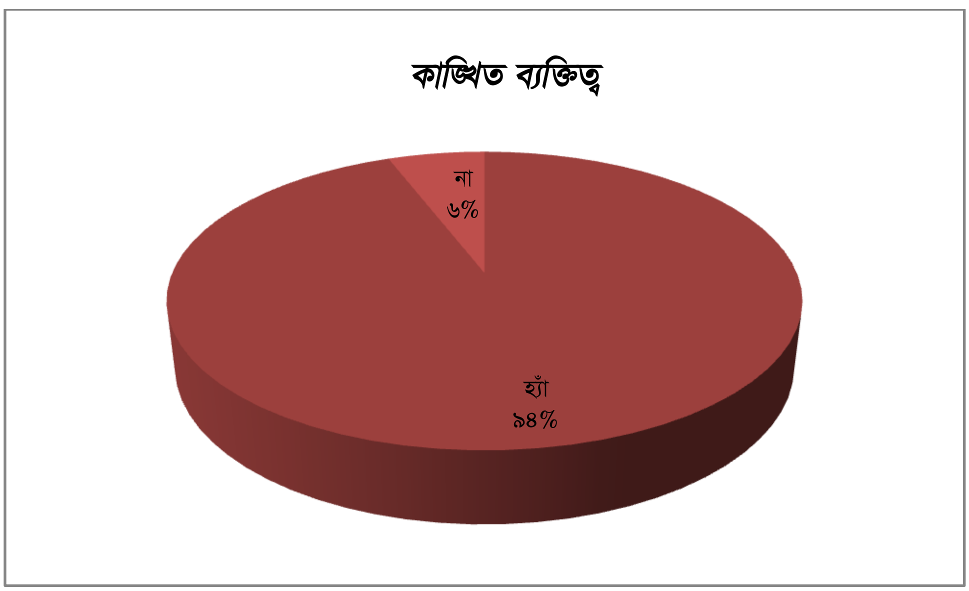

সারণী নং-৪১

সামাজিক পরিবেশ	সংখ্যা	শতকরা হার
সহায়তা পেয়েছে	১৪৭	৮৭.৫
সহায়তা পায়নি	২১	১২.৫
মোট	১৬৮	

গ্রাফ নং -৪১

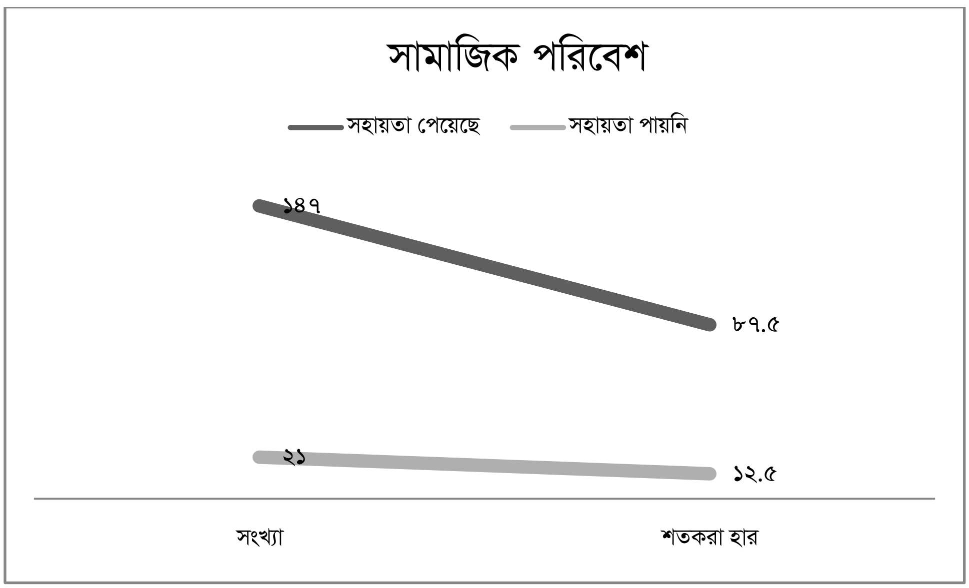

নারী হিসেবে শিক্ষা অর্জনে এলাকার সামাজিক পরিবেশ থেকে অধ্যয়নরত ছাত্রীরা সকলে সহায়ক পরিবেশ পাননি। অনেক ছাত্রীর ক্ষেত্রে তাদের সামাজিক পরিবেশ তাদের অনুপ্রেরণা দিয়েছে, উৎসাহ দিয়েছে মেয়ে হিসেবে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত প্রায় ৮৭.৫% ছাত্রী তাদের সামাজিক পরিবেশ থেকে সহায়তা পেয়েছে। মাত্র ১২.৫% ছাত্রী তাদের সামাজিক পরিবেশ থেকে কোন রকম সহায়তা পাননি। যারা সামাজিক পরিবেশ থেকে সহায়তা পাননি। তারা যেসব মন্তব্য করেছে-

-“বিরূপ পরিবেশ পেয়েছি, কারণ আমার এলাকায় মেয়েদের পড়ার সুযোগ কম”

-“ অনেক ক্ষেত্রে ইভটিজিং আবার আত্মীয়-স্বজনদের পক্ষ থেকে বাবামায়ের বিয়ে দেয়ার চাপ সৃষ্টি”

-“মেয়েদের উচ্চশিক্ষা এলাকার মানুষ পছন্দ করে না, তারা নেতিবাচক আচরণ করে।”

-“মেয়েদের হলে থাকাকে অনেক অপছন্দ করে।”

-“ অনেক সময় দুর্নীতির স্বীকার করেছি, যা আমাকে লেখাপড়ায় অনুৎসাহিত করেছে।”

সারণী নং-৪২

চ্যালেঞ্জ	সংখ্যা	শতকরা
সমম্মুখীন হন নি	৯৩	৬৭.৩৯
সম্মুখীন হয়েছেন	৫৫	৩৯.৮৬
মোট	১৩৮	

গ্রাফ-৪২

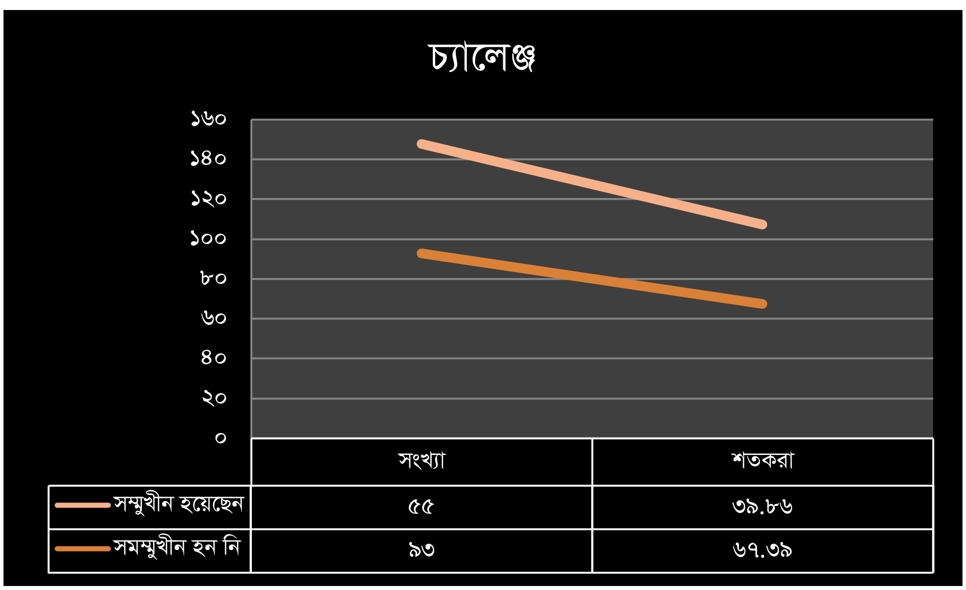

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রীরা তাদের শিক্ষা জীবনে কখনো চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হননি, এমন ছাত্রীর সংখ্যা ৬৭.৩৯%। আবার অনেক ছাত্রী তাদের শিক্ষাজীবনে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন

হয়েছেন, এমন ছাত্রীর সংখ্যা ৩৯.৮৬%। যেসকল ছাত্রী জীবনে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছেন তাদের সংখ্যা কম। তারা যেসকল চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছেন-

-আর্থিক, নিরাপত্তামূলক, মানসিক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন প্রায় ১০ জন ছাত্রী"।

-"শারীরিক অসুস্থতা, মায়ের অসুস্থতা, নিরক্ষরতা,বাবার অসুস্থতার কারনে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছেন ৫ জন ছাত্রী।"

-"ক্লাস সেভেন এ থাকাকালীন সময়ে ক্যান্টনমেন্ট স্কুলের বেতন হঠাৎ করে দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছিল, তখন বাধ্য হয়ে অন্য স্কুলে যেতে হয়েছিল, কিন্তু নতুন স্কুলে এসে আমার জীবনের মোড় পাল্টে যায়। একের পর এক সাফল্যে আমি আনন্দিত।"

-বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বে শিক্ষাজীবনে কোন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হননি। শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি অনেক ছাত্রের জন্যই ভাল ফলাফলের একটা চ্যালেঞ্জ। মেয়েদের ক্ষেত্রে এই চ্যালেঞ্জ অনেক সময় দুর্নীতি থেকে যৌন হয়রানি পর্যন্ত গড়ায়"

-এস.এস.সি .,এইচ .এস.সি. পরীক্ষায় জি.পি.এ-৫ পাওয়া ছিল চ্যালেঞ্জ। তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কাঙ্খিত বিষয়ে ভর্তি হওয়া ছিল আমার জীবনের চ্যালেঞ্জ।'

-মফস্বল থেকে ঢাকায় এসে থাকা ও খাওয়া নিয়ে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। আবার মেয়ে হিসেবে অনেক সামাজিক বাধা আসে। অনেক সময় স্তুতি শুনতে হয়েছে।

-স্কুলে যাওয়ার সময় ইভটিজিং এর শিকার হয়েছেন, হিজাব পরার কারনে তিন বার বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু শিক্ষকের বিরুপ মন্তব্য শুনেছেন।"

-চারুকলা অনুষদে ৮ জন ছাত্রের একজন মেয়ে হওয়াটা ছিল চ্যালেঞ্জ।

-ভার্সিটি হল সঙ্গে সঙ্গে না পাওয়ায় আত্মীয়ের বাসায় কষ্ট করে থাকতে হয়েছে।

৮ম অধ্যায়

ফলাফল, সিদ্ধান্ত , সুপারিশ

৮.১ গবেষণার ফলাফল

৮.২.সিদ্ধান্ত

৮.৩. সুপারিশ

নবম অধ্যায়

ফলাফল, সিদ্ধান্ত , সুপারিশ

৮.১ গবেষণার ফলাফল

"ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রীদের সামাজিক প্রেক্ষাপট অনুসন্ধান" শীর্ষক গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যসমূহ বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলসমূহ নিচে উপস্থাপন করা হল-

৮.১.১.এই গবেষণায় গবেষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫২ টি বিভাগ এর ছাত্রীদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। এই গবেষণায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ছাত্রীদের অংশগ্রহন বেশি। স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ৭১.৪% ছাত্রী গবেষণায় অংশগ্রহন করেছে। স্নাতক তৃতীয় বর্ষের ৬৮% ছাত্রী, দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ষের ৮.২.৭% ও ৫৬.১% ছাত্রী অংশগ্রহণ করেছে। সবচেয়ে কম অংশগ্রহন করেছে এম.ফিল. পর্যায়ের ছাত্রীরা। গবেষকের গবেষণার তথ্যবিশ্ব ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদ ও ইনস্টিটিউট এর স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা। গবেষণায় ব্যবহৃত নমুনা দল গবেষকের উদ্দেশ্যের প্রতিফলন ঘটিয়েছে।

৮.১.২. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত দুই তৃতীয়াংশ ছাত্রী আবাসিক হলে অবস্থান করে। অধ্যয়নরত ছাত্রীদের মধ্যে ৮৫.৯% ছাত্রী আবাসিক হলে অবস্থান করে, ১৪.১% ছাত্রী অনাবাসিকভাবে রয়েছে।

৮.১.৩. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত প্রায় ৯০% ছাত্রী মুসলমান।

পারিবারিক বিষয়

৮.১.৪. সাম্প্রতিক সময়ে যৌথ পরিবারগুলো ভেঙ্গে একক পরিবারের সংখ্যা বাড়ছে। অধ্যয়নরত ছাত্রীদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৪৩ জন এমন পরিবারের সংখ্যা বেশি। ৩২% ছাত্রীর পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৪ জন।

৮.১.৫.ছাত্রীদের কারো পিতাই নিরক্ষর নন। ৩৮.২৪% ছাত্রীর পিতা স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী। ১১.৭৬% ছাত্রীর বাবা এইচ.এস.সি. ও ৮.৮২% ছাত্রীর বাবা এস.এস.সি. ডিগ্রিধারী। যাদের পিতা স্বাক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন এমন ছাত্রীর সংখ্যা মাত্র ১.১৮%।

৮.১.৬. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রীদের মধ্যে ২৪.৩৭% ছাত্রীর মা স্নাতক ও ৭.৫% ছাত্রীর মা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী। তবে শিক্ষার প্রাথমিক স্তর সম্পন্ন করেছে ১৩.১৩% ছাত্রীর মা। শিক্ষার মাধ্যমিক স্তর সম্পন্ন করেছে এমন মায়েদের তাদের মেয়েদের শিক্ষিত করার আগ্রহ বেশি।

৮.১.৭. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রীদের পিতারা সমাজের মর্যাদাপূর্ণ পেশায় নিয়োজিত আছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা গ্রাম.শহর যেখানেই অবস্থান করুক না কেন তাদের পারিবারিক অবস্থা স্বচ্ছল। ৩৫% ছাত্রীর পিতা চাকুরীজীবী। ব্যবসা ও শিক্ষকতা পেশার সাথে নিয়োজিত আছেন ২৭% ও ১৫% ছাত্রীর পিতা।

৮.১.৮. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রীদের মধ্যে শতকরা ৮৩.৮৫% শিক্ষার্থীর মা গৃহিণী। এছাড়া শিক্ষকতা ও চাকুরীর সাথে সম্পৃক্ত রয়েছেন ৮.০৭% মা। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, যেসব শিক্ষার্থী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে তাদের মধ্যে যাদের মায়েরা গৃহিণী তারাই তাদের মেয়েদের উচ্চশিক্ষার বিষয়ে আগ্রহী।

৮.১.৯. ছাত্রীদের মধ্যে ৮৫% উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আগত। ৪৩% নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আগত। সুতরাং বলা যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা অধিকাংশ মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আগত।

৮.১.১০. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রীদের মধ্যে শতকরা ৮৩.৮৫% শিক্ষার্থীর মা গৃহিণী। এছাড়া শিক্ষকতা ও চাকুরীর সাথে সম্পৃক্ত রয়েছেন ৮.০৭% মা। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, যেসব শিক্ষার্থী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে তাদের মধ্যে যাদের মায়েরা গৃহিণী তারাই তাদের মেয়েদের উচ্চশিক্ষার বিষয়ে আগ্রহী।

৮.১.১১. আয়ের অন্যান্য যেমন ব্যবসা থেকে আয় করে ৫০% ছাত্রীর পরিবার। ৪০% ছাত্রীর পরিবার কৃষিকাজ, **১৯%** ছাত্রীর পরিবার গ্রামের সম্পদ থেকে আয় করেন।

বাসস্থান

৮.১.১২. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রীদের মধ্যে এক পঞ্চমাংশ গ্রামে বসবাস করে, দুই পঞ্চমাংশের বেশি জেলা শহর, উপজেলা শহরে বসবাস করে আর মাত্র অল্প কিছু সংখ্যক ছাত্রী রাজধানী ও বিভাগীয় শহরে বসবাস করে। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, অধ্যয়নরত ছাত্রীরা অধিকাংশই শহরের প্রতিনিধিত্ব করে। তবে বিভাগীয় ও রাজধানী শহরের তুলনায় জেলা শহরের মেয়েদের অন্তভুক্তি বেশি লক্ষ্য করা যায়।

৮.১.১৩.বাড়ির ধরন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত অধিকাংশ ছাত্রী পাকাবাড়িতে বসবাস করে। প্রায় ৭০% ছাত্রী পাকাবাড়িতে বসবাস করে। মাত্র ৫% ছাত্রী কাচাঁবাড়িতে বসবাস করে।

৮.১.১৪.বাড়িটি কেমন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রীরা অধিকাংশই নিজস্ব পাকাবাড়িতে বসবাস করে। বাড়িগুলোতে রুমের সংখ্যা ৩-৪ টি। প্রত্যেকের বাড়িতে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ও ইলেকট্রিসিটি রয়েছে। তবে অধিকাংশ শিক্ষার্থীর বাসায় চলাচলের জন্য নিজস্ব বাহন নেই।

অন্যান্য

৮.১.১৫. অন্যান্য অংশ থেকে প্রাপ্ত তথ্য যাচাই করে,ফলাফলে বলা যায় যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের পরিবারে সকলের ভালো খাবার, চিকিৎসার অগ্রাধিকার রয়েছে। সেই সাথে শিক্ষার্থীদের পরিবারে এল্যোপ্যাথি চিকিৎসার সহায়তা নেয়া হয়। সুতরাং বলা যায় যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে

অধ্যয়নরত ছাত্রীদের পরিবারে মেয়ে ও ছেলেদের মধ্যকার দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য প্রায় নেই। পরিবারের পিতামাতা ছেলেমেয়েদের প্রতি সমান মনোভাব পোষণ করেন।

৮.১.১৬.রাজনৈতিক দিক

মানুষ হিসেবে একজন ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার পাশাপাশি ভোট দেয়া, রাজনীতিতে অংশগ্রহন, ধর্মীয় বিধি-নিষেধ পালনে স্বাধীনতা থাকা বাঞ্চনীয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রীরা রাজনীতিতে অংশগ্রহন কিছুটা সমর্থন করে। একেবারে সমর্থন করে না এমন ছাত্রীর সংখ্যা যারা রাজনীতিকে সমর্থন করে তাদের তুলনায় কম। সব ছাত্রীর পরিবারে মতামত প্রকাশ করার স্বাধীনতা ভোগ করে থাকে।

৮.১.১৭. ধর্মীয় দিক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত প্রায় ৯০% ছাত্রীর পরিবার মুসলিম ধর্মের অনুসারী। তবে তার মধ্যে ৪৮.২৪% পরিবারে বিধি-নিষেধ অনেক বেশি অনুসরন করা হয়।

সাংস্কৃতিক,নৈতিক,সামাজিক দিক

৮.১.১৮.ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রীদের মধ্যে সাংস্কৃতিক চর্চায় বই পড়তে পছন্দ করেন বেশির ভাগ ছাত্রীর পরিবার। অনেক ছাত্রীর পরিবার আবার সাংস্কৃতিক চর্চায় বই পড়া, টি.ভি দেখা এই দুই বিষয়কে প্রাধান্য দিয়েছেন। তবে ছাত্রীদের পরিবার গুলো সাংস্কৃতিক চর্চায় একসাথে দুইটি, তিনটি ও চারটি পন্থা অনুসরন করেন।

৮.১.১৯. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রীদের পরিবার সাংস্কৃতিক চর্চায় অনেক বেশি উৎসাহী। পরিবারগুলো সাংস্কৃতিক চর্চায় কোন একটি মাধ্যম বেছে না নিয়ে সকল মাধ্যমে সাংস্কৃতিক চর্চার সুযোগ রেখেছেন তাদের পরিবারে। ছাত্রীদের পিতামাতা তাদের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করতে আগ্রহী এবং তারা পরিবারে মেয়েদের মতামতকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে বিচেনা করে থাকে। অধ্যয়নরত ছাত্রীরা পরিবার থেকে শিক্ষাগ্রহণে কোন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হন না।

৮.১.২০.আবার অধিকাংশ পিতামাতাই তাদের মেয়েদের ২১ বছর এর নিচে ও ২৭ বছর এর অধিক সময়ে বিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে আগ্রহী নন। তবে (২৪-২৬) বছর বয়স মেয়েদের বিবাহের একটি উত্তম বয়স বলে মনে করে অধিকাংশ পিতামাতা। নৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক দিক বিবেচনায় বলা যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা বর্তমানে দেশের সর্বোচ্চ স্থানে আসীন রয়েছেন। সুতরাং বলা যায়, পরিবারে নিজস্ব বিষয়ে মতামত গ্রহন, কোন রকম প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন না হওয়া, শিক্ষার্থীদের পড়াশুনার অগ্রহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের নৈতিক, সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে অনেক সমৃদ্ধ করে তোলে।

৮.১.২১. ব্যক্তিগত মতামত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রীরা বিবাহের ক্ষেত্রে যৌতুক প্রদানকে সমর্থন করে না। তারা যৌতুক নেয়াকে সামজিক ব্যাধি, ধর্মীয়, আইনত নিষিদ্ধ বলে মনে করে। এছাড়া তাদের পিতামাতা মেয়েকে শিক্ষিত ও স্বাবলম্বী করাকে যথোপযুক্ত কাজ বলে মনে করে।

৮.১.২২.অধ্যয়নরত ছাত্রীরা পারিবারিক বন্ধন রক্ষা, পরিবারে মেয়েরা অধিক ভালবাসা পায় এই উক্তিগুলো সমর্থন করে। সকল ছাত্রী পারিবারিক বন্ধন রক্ষার ক্ষেত্রে মেয়েদের ভূমিকার কথা একবাক্য স্বীকার করেছেন।

৮.১.২৩.পরিবারে নারীপুরুষের অবদান সমান। প্রায় ৮৯.৪১% ছাত্রী তাদের পরিবারে নারী-পুরুষ দু'জনের ভূমিকাকেই অগ্রগণ্য মনে করে। যদিও অনেক পরিবারে পুরুষের চেয়ে নারীর অবদান বেশি মনে করা হয়। আবার ছাত্রীদের পরিবারের কাজগুলো সকলে মিলে করা হয় প্রায় ৭৬.৪৭% ছাত্রীর পরিবারে। পরিচারিকা সহযোগে করা হয় ১৪.৭১% ছাত্রীর পরিবারে।

৮.১.২৪.পরিবারে ভাইয়ের সাথে বোনের মর্যাদার পার্থক্য কোন ছাত্রীর পরিবারে নেই। ছাত্রীরা উচ্চশিক্ষিত হওয়ায় তারা তাদের পছন্দ অনুযায়ী চাকরি করতে পারবে। এক্ষেত্রে পরিবার থেকে

কোন বাধা নেই। ৯৫.৮৮% ছাত্রীর পরিবার তাদের শিক্ষাজীবন শেষে চাকরিতে প্রবেশের ক্ষেত্রে আগ্রহী।

৮.১.২৫.ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত প্রায় সকল ছাত্রী তাদের কাঙ্খিত ব্যক্তিত্ব বিকাশে পরিাবরের ভূমিকা রয়েছে বলে মতামত দিয়েছে।

৮.১.২৬.ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের ব্যক্তিগত মতামত, সাংস্কৃতিক, নৈতিক দিক পর্যালোচনা বলা যায়, প্রতিটি ছাত্রীর ব্যক্তিত্ব(সাংস্কৃতিক,নৈতিক) বিকাশে তার পরিবার অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করে। পরিবারে যদি ভাইবোন সমান দৃষ্টিতে দেখা হয় তাহলে পরবর্তী সময়ে তাদের ছেলেমেয়েদের মধ্যকার অবিভিন্নতা চোখে পড়বে। ৮.১.২৭.আত্মনির্ভরশীলতা যে কোন ব্যক্তির কাঙ্খিত ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়ক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রীদের পরিবার তাদের আত্মনির্ভরশীলতাকে উদ্বুদ্ধ করে। পাশাপাশি পারিবারিক বন্ধন রক্ষার ক্ষেত্রে মেয়েদের ভূমিকার গুরুত্ব তারা পরিবার থেকে পেয়ে থাকে। তাই ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের আর্থিক, শিক্ষাগত ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য বিকাশে পরিবার গুরুত্বর্পূণ ভূমিকা পালন করে।

৮.১.২৮. নারী হিসেবে শিক্ষা অর্জনে এলাকার সামাজিক পরিবেশ থেকে অধ্যয়নরত ছাত্রীরা সকলে সহায়ক পরিবেশ পাননি। অনেক ছাত্রীর ক্ষেত্রে তাদের সামাজিক পরিবেশ তাদের অনুপ্রেরণা দিয়েছে, উৎসাহ দিয়েছে মেয়ে হিসেবে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত প্রায় ৮৭.৫% ছাত্রী তাদের সামাজিক পরিবেশ থেকে সহায়তা পেয়েছে। মাত্র ১২.৫% ছাত্রী তাদের সামাজিক পরিবেশ থেকে কোন রকম সহায়তা পাননি।

৮.১.২৯. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রীরা তাদের শিক্ষা জীবনে কখনো চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হননি, এমন ছাত্রীর সংখ্যা ৬৭.৩৯%। আবার অনেক ছাত্রী তাদের শিক্ষাজীবনে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছেন, এমন ছাত্রীর সংখ্যা ৩৯.৮৬%। যেসকল ছাত্রী জীবনে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছেন তাদের সংখ্যা কম।

৮.২.সিদ্ধান্ত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়নরত ছাত্রীরা অধিকাংশই শহরে বসবাস করে। জেলা শহরের মেয়েরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশি অধ্যয়ন করছে। ছাত্রীরা সকলেই নিজস্ব পাকাবাড়িতে বসবাস করে। বাড়িতে রুমের সংখ্যা (৩-৪) টি। বাড়িতে ইলেকট্রিসিটি, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রীদের পিতারা কেউই নিরক্ষর নন। পিতার পেশা চাকুরিজীবী এমন ছাত্রীর সংখ্যা বেশি। প্রায় সকলের ভালো খাবার গ্রহনে ছেলে ও মেয়ে উভয়ের প্রাধান্য রয়েছে। চিকিৎসার ক্ষেত্রে এ্যালোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি উভয় পন্থায় অনুসরন করা হয়।

আবার পিতার মাসিক আয় বিবেচনা করে অধিকাংশ ছাত্রী উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করে।পরিবারগুলোতে ছাত্রীদের ব্যক্তিত্ব গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সাংস্কৃতিক চর্চায় মেয়েরা পরিবার থেকে কোন বাধার সম্মুখীন হন নি। আবার পড়াশুনা শেষ করে চাকরিতে প্রবেশের ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই।

প্রত্যেকটি পরিবারে ধর্মীয় বিধিনিষেধ অনুসরণ করা হয়। রাজনীতিতে অংশগ্রহনে পরিবার থেকে কোন বাধা নেই তবে মেয়েরা রাজনীতিকে সমর্থন করে।পিতামাতা মেয়েদের বিয়ে(২৪-২৬) বছর বয়সে দেয়ার পক্ষপাতী। যৌতুক গ্রহনে সকলেই এটিকে সামাজিক ব্যাধি,আইনত নিষিদ্ধ বলে মনে করেন।

পরিবার নারী পুরুষ সমানের শিক্ষা দেয়া হয়। নারী ও পুরুষ একসাথে পরিবারের কাজগুলো সম্পন্ন করে। পরিবারে সিদ্ধান্ত গ্রহনে মেয়েদের মতামতের অগ্রাধিকার রয়েছে।অধিকাংশ মেয়েরা তাদেরসামাজিক পরিবেশ থেকে সহায়তা লাভ করেছে। তবে অনেক মেয়ে সামাজিক পরিবেশ থেকে বিরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন। আবার অনেক মেয়ে শিক্ষাজীবনে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছেন।সুতরাং অনুমিত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল " ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করে।" তা সত্য প্রমাণিত হলে।

৮.৩. সুপারিশ

এই গবেষণাটিতে গবেষক যেসকল বিষয়ে পরামর্শ দেয়ার প্রয়োজন মনে করেন তা হলে।

-যাদের পিতামাতা স্বাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন, তাদের ব্যক্তিত্ব গঠন যাতে দুর্বল না হয়, সেবিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা গ্রাম থেকে পড়তে এসেছে তাদের আবাসন ব্যবস্থার বিষয়ে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

-মেয়েদের বিয়ে যথাযথ সময়ে দেয়ার জন্য পিতামাতাকে বোঝাতে হবে।

-যৌতুক প্রথার বিরোধী সকল ছাত্রী। পিতামাতাকেও এ বিষয়ে বিরোধী হতে হবে।

-পরিবারে যাতে স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করতে পারে। এজন্য পিতামাতাকে নিয়ে বছরে একবার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সেমিনার আয়োজন করতে পারে।

-যেসব মেয়ে হলে থাকে তাদের যথাযথ নিরাপত্তা, সুষম খাবার, সরববাহের প্রতি হল কতৃপক্ষ অবহিত হতে হবে।

-সামজিক পরিবেশ যেসব ছাত্রীর প্রতিকূল তাদের মানসিকভাবে আরও শক্তিশালী হওয়ার পরামর্শ দিতে হবে।

-ছাত্রীরা যাতে উচ্চশিক্ষাশেষে চাকরিতে প্রবেশ করতে পারে। এজন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বছর শেষে জবসফেয়ার, চাকরিপ্রস্তুতি সর্ম্পকে সেমিনার আয়োজন করতে পারে।

-যারা অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলা করছেন তাদের জন্য টিউশনি ব্যবসবথা করা যেতে পারে।

-মফস্বল থেকে আসা ছাত্রীদের শহরের পরিবেশে অভ্যাস্ত করার জন্য মাসে একবার গেটটুদার এর আয়োজন করে সমস্যাগুলো সমাধানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

উপসংহার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এক অতি গৌরবময় ঐতিহ্যের অধিকারী। এই বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ছাত্রীদের জীবনকে বর্ণে-গন্ধে-সৌন্দর্যে-সুষমায় প্রস্ফুটিত করে সৌরভে ও গৌরবে প্রাণোচ্ছল করে তুলেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের কাছ থেকে প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির আকাঙ্খার যে সম্মিলন ঘটেছে নারী প্রগতিতে তার ভূমিকা কতটা তা নির্ণয় করা গবেষকের অভিপ্রায়। বাংলাদেশের নারী প্রগতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা অনস্বীকার্য। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ও ব্যক্তিজীবনে সফলতার পিছনে এ প্রতিষ্ঠান সর্বদা অগ্রগামী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল, ত্নীক্ষ, বুদ্ধিদীপ্ত ছাত্রীদের আবাসস্থল। বিভিন্ন পরিবেশ ও শ্রেণী থেকে এসে ছাত্রীরা এখানে যৌথ জীবনে প্রবেশ করে। ছাত্রীরা আত্মনির্ভরশীল ও বৃহত্তর জগতে নিজকে মানিয়ে নেয়ার অভ্যাস এখানে রপ্ত করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃহত্তর পরিবেশে শিক্ষার্থীদের পরস্পরের প্রতি দায়িত্ব,শ্রদ্ধাবোধ, মমত্ববোধ, পরমতসহিঞ্চুতা ইত্যাদি গুণাবলির বিকাশ ঘটে। বিশেষত ছাত্রীদের শিক্ষাঅর্জনের অধিকার, সচেনতা বৃদ্ধি ও সামাজিক জীবনে অধিত অভিজ্ঞতা প্রতিফলনের সুযোগ তৈরীতে এই শিক্ষায়তনের কার্যক্রম অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবার পর বর্তমান সময় পর্যন্ত এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডের প্রতিটিতে ছাত্রদের সাথে সমদায়িত্ব পালন করেছে। তাই ভাষা আন্দোলন, স্বাধীকার ও স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে ছাত্রীদের অংশীদারিত্ব ও অবদান সর্বক্ষেত্রে স্বীকৃত। বর্তমানে বাংলাদেশে মূল উন্নয়নের স্রোতধারায় যেসব নারী সম্পৃক্ত রয়েছেন তার সিংহভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকান্ড পরিচালনার পদ্ধতি ছাত্রীদের ব্যক্তিত্ব ও জীবন গঠনে বিরাট প্রভাবক হিসেবে কাজ করে চলেছে।

গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রীরা অধিকাংশই শহরে বসবাস করে। জেলা শহরের মেয়েরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশি অধ্যয়ন করছে। আবার পিতার মাসিক আয় বিবেচনা করে অধিকাংশ ছাত্রী উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করে।পরিবারগুলোতে ছাত্রীদের ব্যক্তিত্ব গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সাংস্কৃতিক চর্চায় মেয়েরা পরিবার থেকে কোন বাধার সম্মুখীন হন নি। আবার পড়াশুনা শেষ করে চাকরিতে প্রবেশের ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই।প্রত্যেকটি পরিবারে ধর্মীয় বিধিনিষেধ অনুসরণ করা হয়। রাজনীতিতে অংশগ্রহনে পরিবার থেকে কোন বাধা নেই তবে মেয়েরা রাজনীতিকে সমর্থন করে।পিতামাতা মেয়েদের বিয়ে(২৪-২৬) বছর বয়সে দেয়ার পক্ষপাতী। যৌতুক গ্রহনে সকলেই এটিকে সামাজিক ব্যাধি,আইনত নিষিদ্ধ বলে মনে করেন।পরিবারে নারী পুরুষ সমান এ শিক্ষা দেয়া হয়। নারী ও পুরুষ একসাথে পরিবারের কাজগুলো সম্পন্ন করে। পরিবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে মেয়েদের

মতামতের অগ্রাধিকার রয়েছে। অধিকাংশ মেয়েরা তাদের সামাজিক পরিবেশ থেকে সহায়তা লাভ করেছে। তবে অনেক মেয়ে সামাজিক পরিবেশ থেকে বিরুপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন। আবার অনেক মেয়ে শিক্ষাজীবনে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছেন।

এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষানুরাগ, কলুষমুক্ত চিন্তা চেতনার উন্মেষ, পারস্পারিক শ্রদ্ধাবোধ, উন্নত সাংস্কৃতিক ভাব বিনিময় জ্ঞানভিত্তিক সমাজ বিনির্মানের প্রচেষ্টা ও দেশের কল্যাণে সুস্থ রাজনৈতিক চেতনা বিকশিত হয়। সর্বপরি এখানে ছাত্রীরা আদর্শ ও মূল্যবোধের মাধ্যমে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটানো এবং উন্নত সমাজ গঠনের অনুশীলনের সুযোগ পায়। ছাত্রীদের ব্যক্তিত্ব গঠনে ব্যাপক প্রভাবকের ভূমিকা রাখে। যা তাদের সমগ্র জীবন পরিচালনার উৎস ও শক্তি হিসেবে তাদের স্বত্তার মধ্যে বিরাজমান থাকে। এ শক্তির ক্রমধারা নারীপ্রগতিকে প্রবাহিত করে চলেছে যুগে যুগে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীরা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য কর্মজীবনে প্রবেশ করে স্বাবলম্বী হবে এবং পরনির্ভরশীল ও অধস্তন অবস্থা থেকে নিজেদের আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার কাজে ব্রতী হবে। সমাজে পিছিয়ে পড়া নারীদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কর্মসংস্থানের নিশ্চিত অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে কাজ করবে।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

গ্রন্থপঞ্জি

১.হোসেন.সেলিনা ও মাসুদজ্জামান,বাংলাদেশের নারী ও সমাজ(ইদানীং মহিলারা),মাওলা ব্রাদার্স,ঢাকা।

২. হোসেন.সেলিনা ও মাসুদজ্জামান,বাংলাদেশের নারী ও সমাজ(শাস্ত্র ,সমাজ ও নারীমুক্তি, পৃঃ-২১),মাওলা ব্রাদার্স,ঢাকা।

৩.হোসেন.সেলিনা,নারী প্রগতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও রোকেয়া হল,২০১১,শ্রাবণ প্রকাশনী,ঢাকা।

৪. বানু.সুলতানা ,বিকাশ মনোবিজ্ঞান, ,১৯৯৭,বাংলা একাডেমী,ঢাকা।

৫. প্রভাতাংশু মাইতি, ভারত ইতিহাস পরিক্রমা (প্রাচীন যুগ-১২০৬ খ্রিঃ),১৯৯১,শ্রীধর প্রকাশনী, ,কলকাতা।

৬.চট্টোপাধ্যায়.সুনীল, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস(১ম খন্ড), ১৯৯৭,পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ,কলকাতা।

৭. রহিম.এম.এ.[মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান অনূদিত], বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস (দ্বিতীয় খন্ড, পৃ.২৫০), ১৯৯৬,বাংলা একাডেমী,ঢাকা।

৮.আকবর.শ্যামলী ও অন্যান্য, নারী শিক্ষা উদ্ভব ও বিকাশ, ১৯০০, ষ্টুডেন্ট ওয়েজ প্রকাশনী,বাংলা বাজার, ঢাকা।

৯. আলম,জাহেদ, খান,থিসিস নং-২৭১, শিরোনামঃ গ্রাম ও শহরের নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের আর্থ- সামাজিক অবস্থা ও গণিত বিষয়ে তাদের অর্জিত জ্ঞানের তুলনামূলক পর্যালোচনা ।

১০. রহমান,ছিদ্দিকুর, এম.ফিল. ডিগ্রির চাহিদা পূরণার্থে “পরিবারে কিশোর অপরাধের আর্থ সামাজিক প্রভাব” (২০১০) গবেষণাটি সম্পন্ন করেন।

১১. রহমান. বিলকিস. পি.এইচ.ডি ডিগ্রির চাহিদা পূরণার্থে “ উনিশ শতকে বাংলার মধ্যবিত্ত পরিবারে নারী পুরুষ সম্পর্ক” (২০১১) ইতিহাস বিভাগে গবেষণাটি সম্পন্ন করেন।

১২. হক. এমদাদুল.এ.কে.এম. পি.এইচ.ডি. ডিগ্রির চাহিদা পূরণার্থে" বাংলাদেশে নারী নেতৃত্বের আর্থ সামাজিক পটভূমি" (২০০৯) রাস্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে গবেষণাটি সম্পন্ন করেন।

১৩.সোলায়মান,সামছিয়া, আই.ই.আর. এম.এড. ডিগ্রির আংশিক চাহিদা পূরণার্থে"আর্থ সামাজিক অবস্থাভেদে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের তারতম্য" (১৯৮৪)

১৪.বেগম,আফছির ,আই.ই.আর. এম.এড. ডিগ্রির আংশিক চাহিদা পূরণার্থে" ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদে অধ্যয়নরত ছাত্রীদের সামাজিক পটভূমিকা ও উচ্চশিক্ষালাভে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি যাচাই"

১৫.মজুমদার,শিবাণী আই.ই.আর.(এম.এড) ডিগ্রির আংশিক চাহিদা পূরণার্থে "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা নির্ণয়"

১৬.আরজু, মোহসিনা আই.ই.আর. এম.এড. ডিগ্রির আংশিক চাহিদা পূরণার্থে" পিতামাতার আর্থ সামাজিক অবস্থাভেদে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের ফলাফলের তারতম্য নিরূপণ"

১৭.. প্রথম আলো,উচ্চশিক্ষা ও চাকরিতে নারী এখনো পিছিয়ে, ৭ মার্চ,২০১৫

১৮. প্রথম আলো,কর্মসংস্থান ও সক্ষমতায় বাংলাদেশের অগ্রগতি মাস্টার কার্ডের জরিপ, ৮ মার্চ,২০১৫

১৯. প্রথম আলো, নারী এখনো পিছিয়ে,৭ মার্চ,২০১৫

২০.প্রথম আলো,কর্মসংস্থান ও সক্ষমতায় বাংলাদেশের অগ্রগতি মাস্টার কার্ডের জরিপ, ৮ মার্চ,২০১৫

২১. প্রথম আলো ,ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের ভূমিকা কতটা ইতিবাচক?,২৭ মার্চ,২০১৫

২২. প্রথম আলো, নারী ঘরেই বেশি নির্যাতিত,নারী নির্যাতন নিয়ে সরকারের প্রথম জরিপ,২৩ জানুয়ারি,২০১৫.

২৩. প্রথম আলো, ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের ভূমিকা কতটা ইতিবাচক,২৭ মার্চ,২০১৫

২৪. অনন্যা ম্যাগাজিন,নারীবাদ ও উন্নয়ন।

২৫. মানব কণ্ঠ, নারী দিবসের ইতিহাস, ৮ মার্চ ২০১৪

২৬.august bebel, women in the past,present and future,germany,germany (১৮৭৯)

২৭ .www.beshto.com/questionid/18925 ,Mar 8, 2014 - ১৯০৮

২৮.http://www.manobkantha.com/2014/03/08/162856.

২৯. http://www.bd24live.com/bangla/article/29827/index.html#

৩০. www.bangladesh.gov.bd

৩১. www.moe.gov.bd.

৩২ www.social perspective.

৩৩.https://bn.wikipedia.org/wiki/

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

প্রশ্নমালা

প্রিয় উত্তরদাতা

শুভেচ্ছা নিবেন।এই প্রশ্নমালাটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট এর এম.ফিল. কার্যক্রমের একজন শিক্ষার্থীর গবেষণা সংক্রান্ত কাজে তথ্য সংগ্রহের জন্য তৈরি করা হয়েছে। গবেষণাটি বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে গুরুত্বপূর্ণ। এই গবেষণাটি পরিচালনার জন্য আপনার কাছ থেকে কিছু তথ্য নেয়া প্রয়োজন। আপনার দেয়া তথ্য শুধু গবেষণার কাজে ব্যবহার করা হবে এবং তথ্যের গোপনীয়তা সম্পূর্ণ রক্ষা করা হবে। গবেষণা কার্যটির প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদানের জন্য আপনার আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছি। তাই সঠিক তথ্য দিয়ে গবেষণাটিতে সহায়তা করার জন্য গবেষক হিসেবে আমি আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।

এম.ফিল. গবেষক
শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষণার শিরোনাম: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রীদের সামাজিক প্রেক্ষাপট অনুসন্ধান

প্রশ্নমালা

সাধারণ তথ্য

১.১ যে বিভাগ/ইনস্টিটিউটে অধ্যয়ন করছেন:	
১.২ যে বর্ষে অধ্যয়ন করছেন:	
১.৩. আবাসিক / অনাবাসিক :	
১.৩. যে ধর্ম অনুসরণ করেন:	

প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উত্তর লিখুন অথবা(সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন দিন)

২.পারিবারিক বিষয়:(শিক্ষাগত ও আর্থিক দিক)

২.১.পরিবারের সদস্য সংখ্যা	২.২. শিক্ষাগত যোগ্যতা	২.৩. পেশা	২.৪.মাসিক আয়	২.৫.আয়ের অন্যান্য উৎস
ক) বাবা				
খ) মা				
গ) ভাই ১. .... ২. .... ৩.				
ঘ) বোন ১. .... ২. .... ৩.				
ঙ) অন্যান্য ১. .... ২. .... ৩.				

বাসস্থান

২.৬, পিতামাতার বসবাসের স্থান:

ক) গ্রাম	খ) উপ-জেলাশহর	গ) জেলা শহর	ঘ) বিভাগীয় শহর	ঙ) রাজধানী

২.৭. বসবাসরত বাড়িটির ধরন কেমন?

ক) পাকাবাড়ি	খ) আধা-পাকাবাড়ি	গ) কাঁচাবাড়ি (বাঁশ,কাঠ,ছন,মাটি)	ঘ) অন্যান্য.........

২.৮. বসবাসরত বাড়িটি কেমন?

ক) নিজস্ব বাড়ি	খ) ভাড়া বাড়ি ● ভাড়ার পরিমাণ কত................	গ) আত্মীয়ের বাড়ি	ঘ) সরকারি বাড়ি	ঙ) অন্যান্য ....

২.৯. বাড়িতে কক্ষের সংখ্যা কতটি?

২ টি ☐	৩ টি ☐	৪ টি ☐	৫ টি ☐	অন্যান্য ....

২.১০. বাড়িতে ইলেকট্রিসিটি আছে কিনা?

ক) হ্যাঁ	খ) না

২.১২. বাড়িতে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা আছে কিনা?

ক) হ্যাঁ	খ) না

২.১১. বিশুদ্ধ পানির উৎস কী?

....

২.১৩. পরিবারের নিজস্ব যানবাহন আছে কিনা?

ক) হ্যাঁ	খ) না

যদি হ্যাঁ হয় তবে তা কী?

....

অন্যান্য

২.১৪. পরিবারে ভালো খাবার গ্রহণের অগ্রাধিকার বেশি কার?

ক) ছেলেদের	খ) মেয়েদের	গ) উভয়ের	ঘ) পরিবারের প্রধানগণের	ঙ) সকলের

২.১৫. পরিবারে কারও অসুখ হলে আপনার পিতামাতা/অভিভাবক কোন ধরনের চিকিৎসার সহায়তা নেন?

ক) এল্যোপ্যাথি	খ) কবিরাজি	গ) ঝাড়-ফুঁক-পানি পড়া	ঘ) হোমিওপ্যাথি	ঙ) অন্যান্য.............

২.১৬.পরিবারে চিকিৎসার ক্ষেত্রে কাকে বেশি অগ্রাধিকার দেয়া হয়।

ক) ছেলেদের	খ) মেয়েদের	গ) উভয়ের	ঘ) পরিবারের প্রধানগণের	ঙ) সকলের

৩.রাজনৈতিক বিষয়

৩.১. রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণকে আপনার পরিবার কীভাবে দেখে।

ক) অনেক বেশি সমর্থন দেয়	খ) সমর্থন করে না	গ) কিছুটা সমর্থন করে	ঘ) একেবারে সমর্থন করে না

৩.২.স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করার অধিকার পরিবারে রয়েছে কিনা ?

ক) হ্যাঁ	খ) না

৩.৩.ভোট দেয়ার অধিকার আপনার পরিবার সমর্থন করে করে কিনা?

ক) হ্যাঁ	খ) না

৪. ধর্মীয় দিক

৪.১. পরিবারে ধর্মীয়বিধি-নিষেধ কেমন অনুসরণ করা হয় ?

ক) অনেক বেশি	খ) কিছুটা অনুসরণ করা হয়	গ) একেবারে অনুসরণ করা হয় না	ঘ) মন্তব্য নেই

৫. সাংস্কৃতিক, নৈতিক, সামাজিক দিক

৫.১ পরিবারে সাংস্কৃতিক চর্চায় কোনটি অনুসরণ করতে আপনার পরিবার পছন্দ করেন।

ক) বইপড়া	খ) টি.ভি দেখা	গ) গান, নাচ করা	ঘ) ভ্রমণ করা	ঙ) অন্যান্য.........

৫.২. পরিবারে সাংস্কৃতিক চর্চায় কোন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয় কি না?

ক) হ্যাঁ	খ) না

৫.৩.পরিবারের সদস্যরা টি.ভি.তে কোন ধরনের অনুষ্ঠান দেখতে পছন্দ করেন।

ক)বিনোদনমূলক	খ) শিক্ষামূলক	গ) খেলাধুলামূলক	ঘ) অনুসন্ধানমূলক	ঙ) অন্যান্য

৫.৪. মেয়েদের উচ্চ শিক্ষায় আপনার পরিবার কতটা আগ্রহী?

ক) খুব বেশি	খ) মোটামুটি	গ) সামান্য	ঘ) মন্তব্য নেই

৫.৫.পিতামাতা আপনাকে কতদূর পর্যন্ত পড়াতে আগ্রহী ।

ক) স্নাতক	খ) স্নাতকোত্তর	গ) এম.ফিল.	ঘ) পি.এইচ.ডি.	ঙ) অন্যান্য

৫.৬.আপনার নিজস্ব বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে আপনার পরিবার আপনার মতামতকে কতটা গুরুত্ব দেয়।

ক) খুব বেশি	খ) মোটামুটি	গ) সামান্য	ঘ) মন্তব্য নেই

৫.৭.দেশের বিভিন্ন উচ্চ পর্যায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণের বিষয়টি আপনার পরিবার সমর্থন করেন কী?

ক) হ্যাঁ	খ) না

৫.৮. আপনার পরিবারে কোন কোন বিষয় নারীরশিক্ষায় প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে বলে আপনার মনে হয়।

ক) অজ্ঞতা	খ) সামাজিক বাধা	গ) ছেলেসন্তানের অগ্রাধিকার	ঘ) পিতামাতার অদূরদর্শিতা	ঙ) কোন রকম প্রতিবন্ধকতা তৈরী করে না।

আপনার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দিন।

....

৫.৯.মেয়েদের বিবাহের বয়সসীমা কেমন হওয়া উচিত বলে আপনার পিতামাতা মনে করেন?

ক) ২১ বছর এর নিচে	ক) ২২-২৪ বছর	খ) ২৪-২৬ বছর	গ) ২৫-২৭ বছর	ঘ) ২৭ এরঅধিক

৬.ব্যক্তিগত মতামত

৬.১.বিবাহের ক্ষেত্রে যৌতুক প্রদানকে আপনার পরিবার সমর্থন করেন কি না?

ক) হ্যাঁ	খ) না

উত্তরের পেছনে কারণ বর্ণনা করুন?

....
....

৬.২.পারিবারিক বন্ধন রক্ষা করার ক্ষেত্রে মেয়েরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

ক) হ্যাঁ	খ) না

৬.৩. পরিবারে মেয়েরা অধিক ভালবাসা পায়, মেয়েদের দ্বারা পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় হয়।

ক) হ্যাঁ	খ) না

৬.৪.পরিবারে অবদান রাখার ক্ষেত্রে নারী পুরুষের ভূমিকা কতটুকু?

ক)নারীর চেয়ে পুরুষের অবদান বেশি	খ) পুরুষের চেয়ে নারীর বেশি	গ) দুজনেরই সমান

৬.৫.পরিবারের কাজগুলো বাবা-মা কিভাবে করে।

ক) শুধু বাবা করেন	খ) শুধু মা করেন	খ) সকলে মিলে করা হয়	ঘ) পরিচারিকা সহযোগে করা হয়

৬.৬.পরিবারে আপনার ভাইয়ের সাথে মর্যাদার দিক থেকে আপনার অবস্থান কেমন।
(যদি ভাই থাকে সেক্ষেত্রে প্রযোজ্য)

ক) একই মর্যাদার	খ) দুইজনের মর্যাদা আলাদা

৬.৭.শিক্ষাজীবন শেষে চাকরিতে প্রবেশের ক্ষেত্রে পরিবারে কোন বাধা-নিষেধ আছে কিনা।

ক) হ্যাঁ	খ) না

৬.৮.আপনার কাঙ্খিত ব্যক্তিত্ব বিকাশে আপনার পারিবারিক পরিবেশ কি কোন ভূমিকা পালন করেছে।

ক) হ্যাঁ	খ) না

৬.৯. নারী হিসেবে শিক্ষাঅর্জনে আপনার এলাকার সামাজিক পরিবেশ থেকে কিরূপ সহায়তা লাভ করেছেন।
....
....

৬.১০. আপনি শিক্ষাজীবনে কী কী চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছেন।
....
....
....

ধন্যবাদ